দস্যু বনহুর
ও
মিঃ হিলালী
রোমেনা আফাজ

দস্যু বনহুর সিরিজ

দস্যু বনহুর ও মিঃ হেলালী-৭১

রোমেনা আফাজ

সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

মিঃ ইয়াসিন যখন ভাবছে অর্থের কথা—যদি কোনো ক্রমে দুই লাখ টাকা হস্তগত করতে পারেন তাহলে তিন পুরুষকাল তাঁর কেটে যাবে, কিছু ভাবতে হবে না।

তখন দস্যু বনহুর ভাবছে তার মায়ের কথা। হঠাৎ শহরের আস্তানায় গিয়ে হাজির হয়েছে, এমন সময় রহমান ফিরে আসে চৌধুরী বাড়ি থেকে—মুখখানা তার গম্ভীর ভাবাপন্ন।

বনহুর স্বাভাবিক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছিলো—সংবাদ কি রহমান?

রহমানের চোখ দুটো ছলছল করে উঠেছিলো—মাথা নিচু করে বললো সে—সর্দার, বেগম সাহেবার ভীষণ অসুখ।

চমকে উঠেছিলো বনহুর রহমানের কথায়—মায়ের অসুখ। কি হয়েছে তাঁর?

খুব জ্বর আজ ক'দিন থেকে। ভুল বকছেন তিনি।

ডাক্তার দেখানো হয়েছে কি?

হাঁ সর্দার, ডাক্তার দেখানো হচ্ছে কিন্তু একটুও অসুখ কমেনি।

বনহুর চিন্তিত কণ্ঠে বলেছিলো—মাকে দেখতে যাবো।

রহমান বলেছিলো—সর্দার, পুলিশ বাহিনী যেভাবে চৌধুরী বাড়ির উপর কড়া পাহারা রেখেছে……

মাকে দেখতে যেতেই হবে রহমান।

বনহুর চিন্তা করেছিলো কিভাবে যাবে সে চৌধুরী বাড়ি। তারপর উপায় সে খুঁজে পেয়েছিলো। উন্মুখ হৃদয় নিয়ে সে চলেছে, না জানি মাকে সে কেমন অবস্থায় দেখবে কে জানে……একসময় চৌধুরী বাড়ি গাড়ি পৌঁছলো।

রাত তখন তিনটা।

গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালেন মিঃ ইয়াসিন।

ড্রাইভার এগিয়ে যাবার পূর্বেই শের আলী নেমে গিয়ে কলিং বেল টিপলো।

বেরিয়ে এলেন সরকার সাহেব।

বেগম সাহেবার অসুখের জন্য বাড়ির সবাই জেগে ছিলো, সরকার সাহেব কলিং বেলের শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলেন।

দরজা খুলতেই সম্মুখে পুলিশ অফিসার দেখে চমকে উঠলেন না তিনি, কারণ এটা আজ নতুন নয়। হঠাৎ এমনি করে প্রায়ই পুলিশ অফিসারগণ এসে বাড়ি খানাতল্লাশী চালিয়ে যায়। তিনি অভ্যা¯মত দরজা খুলে সরে দাঁড়ালেন।

মিঃ ইয়াসিন শের আলীসহ প্রবেশ করলেন হলঘরের মধ্যে।

মিঃ ইয়াসিন বললেন—সরকার সাহেব, শের আলী আপনাদের বাড়ির মধ্যে যাবে, আপনি তাকে নিয়ে যান।

গম্ভীর কণ্ঠে বললেন সরকার সাহেব—বেগম সাহেবা খুব অসুস্থ, এ সময়......

মিঃ ইয়াসিন কিছু বলবার আগেই বললো শের আলী—কোনো অসুবিধা হবে না, চলুন।

সরকার সাহেব কোনো রকম মতামত প্রকাশ করবার পূর্বেই শের আলী অন্তপুরের দিকে পা বাড়ালো।

মিঃ ইয়াসিন আসন গ্রহণ করলেন।

সরকার সাহেব শের আলীর আচরণে মনে মনে কিছুটা ক্ষুব্ধ হলেন বটে কিন্তু প্রকাশ্যে তিনি কোনো কথা না বলে তার পিছু পিছু অগ্রসর হলেন।

শের আলী সিঁড়ি বেয়ে সোজা উঠে গেলো উপরে।

সরকার সাহেব পিছনে এগিয়েও তার নাগাল পাচ্ছেন না। শের আলী প্রতি পায়ে দু'তিনখানা সিঁড়ির ধাপ অতিক্রম করে চলেছে।

সরকার সাহেব উপরে উঠবার পূর্বেই শের আলী প্রবেশ করলো মরিয়ম বেগমের কক্ষে।

মনিরা মামীমার শিয়রে বসে হাতপাখা দিয়ে বাতাস করছিলো, আচমকা একটি পুলিশের লোককে কক্ষে প্রবেশ করতে দেখে হকচকিয়ে গেলো—সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো মনিরা।

শের আলীবেশী দস্যু বনহুর দ্রুতহস্তে তার বিরাট গোঁফ জোড়া খুলে মাথার ক্যাপটা টেবিলে ছুড়ে ফেলে দিয়ে ডাকলো—মনিরা!

মনিরা দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠে—তুমি!

মনিরা, মা কেমন আছে?

মনিরা ঝাঁপিয়ে পড়ে স্বামীর বুকে—ওগো তুমি এসেছো? এতদিন তুমি আমাদের ছেড়ে থাকতে পারলে? তোমার জন্য মামীমা কেঁদে কেঁদে আজ তাঁর এ অবস্থা।

বনহুর মনিরার কথায় কোনো জবাব না দিয়ে এগিয়ে যায় মায়ের বিছানার পাশে, মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে ডাকে সে ব্যাকুল কণ্ঠে—-মা, মাগো, দেখো আমি এসেছি।

মরিয়ম বেগম অজ্ঞান প্রায়, তিনি চোখ মেলে তাকালেন না। বনহুরের কণ্ঠস্বর তাঁর কানে পৌঁছলো না।

. বনহুর বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে পুনরায় ডাকলো—মা, কথা বলো! মাগো—মা...

মনিরা স্বামীর কাঁধে হাত রেখে সান্তনার স্বরে বললো—তুমি পাশে থাকলে মামীমা দু'দিনেই সেরে উঠবেন। ওগো, তোমার জন্য ভেবে ভেবেই তাঁর এমন অবস্থা হয়েছে।

বনহুর চাপা কান্নাকে ঠোঁট কামড়ে আটকে রেখে নিস্পলক নয়নে তাকিয়ে রইলো মায়ের মুখে।

ততক্ষণে সরকার সাহেব এসে পৌঁছে গেছেন। তিনি ক্রুদ্ধভাবেই কক্ষে প্রবেশ করে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। এত বিপদ মুহূর্তেও তাঁর চোখ দুটো আনন্দে দীপ্ত হয়ে উঠে—ছোট সাহেব এসেছেন, এ যে তাঁর খুশির কথা।

বললো বনহুর—নূর কোথায়?

আমার ঘরে ঘুমাচ্ছে। জবাব দিলো মনিরা।

ভাল আছে সে?

আছে।

হঠাৎ বনহুরের দৃষ্টি চলে গেলো সরকার সাহেবের দিকে, বনহুর মায়ের বিছানার পাশ থেকে উঠে এগিয়ে এলো—সরকার সাহেব, মা বাঁচবে তো? কেঁদে ফেললো বনহুর সরকার সাহেবের হাত দু'খানা মুঠায় চেপে ধরে।

ঠিক ঐ মুহূর্তে সিঁড়িতে ভারী বুটের শব্দ শোনা গেলো।

ছুটে এলো বাড়ির পুরোন চাকর আবদুল—আপামনি, একদল পুলিশ সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে আসছে....

বনহুর ফিরে তাকালো আবদুলের দিকে।

সরকার সাহেব এবং মনিরা কিছু বলবার পূর্বেই বনহুর দ্রুতহস্তে ক্যাপ ও গোঁফ তুলে নিয়ে প্রবেশ করলো বাথরুমের মধ্যে। তারপর দরজা বন্ধ করে দিলো। পিছনের শার্সী খোলাই ছিলো, পাইপ বেয়ে নেমে এলো নিচে।

ততক্ষণে মিঃ ইয়াসিন একদল সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে মরিয়ম বেগমের কক্ষের মেঝেতে এসে দাঁড়ালেন।

কক্ষমধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন বৃদ্ধ সরকার সাহেব আর মনিরা।

মিঃ ইয়াসিনের হাতে রিভলভার।

তার পিছনে পুলিশ বাহিনীর হাতে ষ্টেনগান, হালকা মেশিনগান আর রাইফেল।

মিঃ ইয়াসিন গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—দস্যু বনহুর কোথায়? বলুন আপনারা সে কোথায় গেলো?

সরকার সাহেব কিছু বলবার আগেই বললো মনিরা—দস্যু বনহুর এখানে? কে বললো সে এখানে এসেছে?

মিঃ ইয়াসিন ব্যস্তকণ্ঠে বললেন—এই মুহূর্তে এখানে সে ছিলো।

না, আপনারা ভুল করছেন।

ব্যঙ্গপূর্ণ হাসি হেসে উঠলেন মিঃ ইয়াসিন—দেখুন, ভুল আমি করছি না ভুল করছেন আপনারা। দস্যু বনহুর তার অসুস্থ মাকে দেখতে এসেছে এবং তাকে আমি নিজে সঙ্গে নিয়ে এসেছি।

মনিরা তাকালো সরকার সাহেবের মুখের দিকে।

সরকার সাহেব বললেন—হাঁ মা, ওঁনার সঙ্গেই সে এসেছিলো।

সরকার সাহেবের কথা শেষ হয় না, মিঃ ইয়াসিন তার সঙ্গে আগত পুলিশ বাহিনীকে লক্ষ্য করে বলেন—তোমরা দস্যু বনহুরকে খুঁজে বের করো...

পুলিশ বাহিনী খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিলো।

মিঃ ইয়াসিন বললেন—দেখুন, আপনারা ওকে লুকিয়ে রাখতে পারবেন না। যদি পালাতে চেষ্টা করে তবে আমরা তাকে লক্ষ্য করে গুলী ছুড়বো; কাজেই বলুন কোথায় আছে সে?

সরকার সাহেব বলেন—আপনারা বাড়ি খানাতল্লাশী করুন।

বেশ, যদি জীবিত ধরতে না পারি তাকে মৃত অবস্থায় আমরা গ্রেপ্তার করবো।

শিউরে উঠলো মনিরা মিঃ ইয়াসিনের কথায়।

ততক্ষণে পুলিশ বাহিনী সমস্ত বাড়ি তল্লাশী চালাতে শুরু করে দিয়েছে। ছড়িয়ে পড়েছে তারা সর্বত্র।

মিঃ ইয়াসিন বাথরুমের দরজা বন্ধ দেখে দরজা খুলে ফেলার নির্দেশ দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে দু'জন পুলিশ বাথরুমের দরজা খুলে ফেললো।

বাথরুমে প্রবেশ করেই মিঃ ইয়াসিন সুউচ্চ কণ্ঠে বলে উঠলেন—ঐ যে শার্শীর কাঁচ খোলা, দস্যু বনহুর ঐ পথে পালিয়ে গেছে।

এবার পুলিশ বাহিনী সবাই মিলে ছুটলো সিঁড়ি বেয়ে নিচে। মিঃ ইয়াসিন সর্বাগ্রে ছুটেছেন, এমন একটা সুযোগ যেন তিনি না হারান এই তাঁর চেষ্টা।

এদিকে যখন মিঃ ইয়াসিন দলবল নিয়ে নিচে নেমে এলেন তখন বনহুর পিছন পাইপ বেয়ে নেমে এসেছে এবং দ্রুত সে এগিয়ে গেলো গাড়ি-বারান্দার নিচে থেমে থাকা জীপ গাড়িটার দিকে।

অন্যান্য পুলিশ যারা বাড়ির সম্মুখ অংশে প্রহরারত ছিলো তারা শের আলীবেশী বনহুরকে দেখে মনে করে নিজেদের লোক, কাজেই তার দিকে কেউ লক্ষ্য না করে দস্যু বনহুর যাতে না পালাতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখলো।

বনহুর পালাবার সময় গোঁফ জোড়া লাগিয়ে নিয়েছিলো নাকের নিচে, তাই তাকে কেউ চিনতে পারলো না। বনহুর সোজা জীপ গাড়িখানায় উঠে বসে ষ্টার্ট দিলো। মাত্র কয়েক সেকেন্ডেই বেরিয়ে গেলো চৌধুরী বাড়ির গেট পেরিয়ে।

মিঃ ইয়াসিন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন গাড়ি বারান্দায়। কিন্তু ততক্ষণে জীপখানা বেরিয়ে গেছে।

মিঃ ইয়াসিন চিৎকার করে বললেন—দস্যু বনহুর পালিয়ে গেলো ... গ্রেপ্তার করো...গ্রেপ্তার করো...

সমস্ত পুলিশ বাহিনী ততক্ষণে মিঃ ইয়াসিনের চারপাশে এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছে।

কয়েকজন বলে উঠলো—শের আলী গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলো.... গাড়িতে শের আলী...

মিঃ ইয়াসিন পূর্বের ন্যায় চিৎকার করে বললেন—শের আলী নয়, ওটাই দস্যু বনহুর...ওটাই দস্যু বনহুর...গাড়ি নিয়ে ওকে ফলো করো...গাড়ি নিয়ে ওকে ফলো করো...

পুলিশ বাহিনীর চোখেমুখে বিস্ময় ফুটে উঠে। তাদের সম্মুখ দিয়ে শের আলীবেশী দস্যু বনহুর পালিয়ে গেলো অথচ তারা তাকে পাকড়াও করতে সক্ষম হলো না।

গাড়ি নিয়ে ছুটলো কয়েকজন পুলিশ।

কিন্তু কোথায় পাবে সেই জীপখানাকে যে জীপে শের আলী পালিয়েছে।

নিস্তব্ধ রাত্রির জনশূন্য রাজপথে বনহুর অদৃশ্য হয়ে গেছে যেন।

ফিরে আসে পুলিশ বাহিনী গাড়ি নিয়ে।

মিঃ ইয়াসিনের মুখমন্ডল ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে মড়ার মুখের মত। ধপ্ করে বসে পড়লেন তিনি গেটের পাশে দারোয়ানের শূন্য আসনটার উপরে।

মিঃ হারেশ পুলিশ সাব ইন্সপেক্টার। তিনি আজ ক'দিন হলো অবিরত চৌধুরী বাড়ির অদূরে আত্মগোপন করে এ বাড়ি পাহারা দিয়ে চলেছেন। শের আলীবেশী বনহুর যখন জীপে উঠে বসলো তখন তিনি পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন অথচ তিনি জানেন না কাকে হারাচ্ছেন।

মিঃ হারেশ বললেন—স্যার, আমি জানতে পারিনি দস্যু বনহুর শের আলীর বেশে....

আমিও সবাইকে বলার সুযোগ পাইনি, কাজেই দোষ আমার.... এখন বলুন মিঃ হারেশ, আমার জীবন রক্ষার উপায় কি?

স্যার, দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করা সহজ কথা নয়...

তাতো বুঝলাম কিন্তু সে আমাকে বলেছিলো কোনোরকম চালাকি করতে গেলে মৃত্যু আপনার নিশ্চিত। মিঃ হারেশ, এমন সুযোগ আমি নষ্ট করতে পারবো না, তাই ভুলে গিয়েছিলাম তার সে কথা। এখন কি উপায় বলুন? কি করে জীবন রক্ষা করি...

মিঃ হারেশ বললেন—স্যার, এখানে বিলম্ব করা মোটেই উচিত হচ্ছে না। আপনি পুলিশ সুপারকে সব কথা জানান। নিশ্চয়ই তিনি এ ব্যাপারে আপনার জীবন রক্ষার জন্য সুব্যবস্থা নেবেন।

ঠিক বলেছেন মিঃ হারেশ, এখানে আর দেরী করা আমার উচিত হবে না। জানি দস্যু বনহুর যা বলে তাই সে করে কিন্তু আমাকে যেমন করে হোক বাঁচাতেই হবে। দস্যু বনহুরের হাত থেকে নিজকে রক্ষা করতেই হবে...

মিঃ ইয়াসিন দু'জন পুলিশ সহ ফিরে চলেন।

রারবার কলিং বেলের শব্দে মিঃ জাফরীর ঘুম ভেংগে গেলো।

বয় এসে জানালো—স্যার, পুলিশ অফিস থেকে একজন অফিসার এসেছেন। তার সঙ্গে দু'জন রাইফেলধারী পুলিশ আছে।

মিঃ জাফরী বললেন—এত রাতে পুলিশ অফিস থেকে কে এসেছেন? চলো দেখি।

মিঃ জাফরী বেরিয়ে এলেন শয়নকক্ষ থেকে। ড্রইং রুমে প্রবেশ করতেই মিঃ ইয়াসিনকে দেখতে পেয়ে অবাক হলেন তিনি।

মিঃ ইয়াসিন ভয়বিহ্বল উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন—স্যার, দুঃসংবাদ।

ভ্রুকুঞ্চিত করে বললেন মিঃ জাফরী—দুঃসংবাদ?

হাঁ স্যার।

আমি মনে করেছি কোনো শুভ সংবাদ নিয়ে আপনি এসেছেন। দুঃসংবাদ কি ঘটলো আবার?

স্যার সে অনেক কথা, বসুন আমি বলছি।

মিঃ জাফরীর সুখনিদ্রা ভঙ্গ হওয়ায় মনে মনে বিরক্তি বোধ করলেও কর্তব্যের খাতিরে আসন গ্রহণ করে বললেন—বলুন?

মিঃ ইয়াসিনও আসন গ্রহণ করলেন, তারপ রাতের ঘটনা বিস্তারিত খুলে বললেন।

তখন রাত ভোর হয়ে এসেছে।

মিঃ জাফরী যখন মিঃ ইয়াসিনের কথাগুলো শুনছিলেন তখন তার চোখ থেকে ঘুম দূরীভূত হয়ে গিয়েছিলো। রাগে-ক্রোধে ফুলে ফুলে উঠছিলেন তিনি, ঘুমের পরিবর্তে তাঁর দুচোখ দিয়ে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছিলো।

মিঃ জাফরী বলে উঠলেন—আপনি অপদার্থ, তাই হাতে পেয়েও এমন সুযোগ হারিয়েছেন।

স্যার, কোনো উপায় ছিলো না, আমি প্রতি মুহূর্তে তাকে গ্রেপ্তারের জন্য চেষ্টা নিয়েছি কিন্তু...

মিঃ ইয়াসিনকে কথা শেষ করতে দেন না মিঃ জাফরী, বলেন—সাহস পাননি, এই তো?

স্যার, দস্যু বনহুর সব সময় তার রিভলভার সজাগ রেখেছিলো।

মিঃ ইয়াসিন, আপনি দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করতেও সক্ষম হলেন না অথচ মৃত্যুকে বরণ করে নিলেন।

স্যার আমাকে বাঁচান! দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করতে পারবো, এই মনোবল নিয়েই আমি তাকে পাকড়াও করতে গিয়েছিলাম। এখন কি করবো বলুন?

মিঃ জাফরী কিছুক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে ভাবলেন তারপর মিঃ জায়েদীর কাছে ফোন করলেন। ...হ্যালো মিঃ জায়েদী, একটা আকস্মিক ঘটনা ঘটে গেছে, আপনি যদি দয়া করে একবার এখানে আসতেন তাহলে সম্মুখে ঘটনাটা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করা যেতো। ঘটনাটা দস্যু বনহুর সংক্রান্ত। ...হ্যালো, হাঁ হাঁ, আপনি আসতে না পারলে আমরা আসবো কি?...আপনিই আসবেন...ধন্যবাদ...ধন্যবাদ...রিসিভার রেখে বলেন মিঃ জাফরী—মিঃ ইয়াসিন, অপেক্ষা করুন মিঃ জায়েদী আসছেন, তাঁর সঙ্গে এ ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করা যাক।

❑

বনহুর ভাবাপন্নভাবে বিছানায় শুয়ে আছে। সমস্ত মুখমন্ডলে তার দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটে উঠেছে। এলোমেলো চুলগুলো ছড়িয়ে আছে কপালে।

নূরী একটা রেকাবিতে কিছু ফল এবং এক গেলাস দুধ এনে বনহুরের সম্মুখস্থ টেবিলে রাখলো। তারপর টেবিল থেকে দুধের গেলাসটা তুলে নিয়ে বললো—নাও।

খিদে নেই নূরী।

না খেলে চলবে বলো? খাও একটু খানি খাও। নূরী নিজ হাতে দুধের গেলাস তুলে ধরে বনহুরের মুখে।

অগত্যা দুধটুকু খেতে বাধ্য হলো বনহুর।

নূরী এবার পাশে বসে বলে—হুর; কতক্ষণ ছিলে-মায়ের পাশে?

মাত্র কয়েক মিনিট।

তিনি কোনো কথাই তোমার সঙ্গে বলেননি?

না, তিনি সংজ্ঞাহীন ছিলেন। নূরী, জানিনা মায়ের অবস্থা এখন কেমন। বনহুর শুয়েছিলো, বিছানায় উঠে বসলো, তারপর বললো— রহমান ফিরে এসেছে কি?

বললো নূরী—না এখনও সে ফিরে আসেনি। ধীরে ধীরে সে বনহুরের চুলে হাত বুলিয়ে চলে।

জাভেদ ছুটে আসে—আব্বু, চলো তাজের পিঠে উঠবো। আব্বু চলো...

বনহুর ওকে টেনে নেয় কাছে। আদর করে বলে—বেশ, চলো যাচ্ছি।

নূরী বললো—জাভেদ, বিরক্ত করোনা, এখন যাও।

না, আব্বুকে না নিয়ে যাবো না।

বনহুর অগত্যা জাভেদের হাত ধরে উঠে দাঁড়ায়। জাভেদ বনহুরকে একরকম প্রায় টেনে নিয়ে চলে।

বনহুর জাভেদ সহ তাজের পাশে এসে দাঁড়ালো।

তাজ মনিবকে দেখে আনন্দসূচক শব্দ করে উঠলো—চিঁ হিঁ...চিঁ হিঁ...

বনহুর তাজের পিঠে মৃদু আঘাত করলো, তারপর বললো...তাজ দাঁড়া, জাভেদ উঠবে তোর পিঠে।

তাজ মনিবের কথা যেন বুঝতে পারলো, সে স্থির হয়ে দাঁড়ালো।

বনহুর তুলে দিলো জাভেদকে তাজের পিঠে।

জাভেদ দক্ষ অশ্বরোহীর মত ঠিক হয়ে বসলো। বনহুর লাগাম ধরে এগিয়ে চললো।

জাভেদ হাসছে—আব্বু, আমি ঘোড়া চালাচ্ছি।

বনহুরও পুত্রের হাসিতে যোগ দিয়ে বললো—বাঃ! খুব সুন্দর ঘোড়া চালাচ্ছো। ভুলে গেলো বনহুর ক্ষণিকের জন্য মায়ের চিন্তা।

নূরী কখন এসে দাঁড়িয়েছে, সে নিস্পলক নয়নে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলো এ দৃশ্য। পিতা-পুত্রে অপূর্ব এ মিলন দৃশ্য নূরীকে বিমুগ্ধ অভিভূত করে ফেলে।

এখানে যখন বনহুর জাভেদকে নিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়ে তাকে অশ্বে চাপা শেখাচ্ছিলো তখন কান্দাই শহরে চৌধুরী বাড়িতে সংজ্ঞা ফিরে আসে মরিয়ম বেগমের।

সম্পূর্ণ দু'দিন অজ্ঞান থাকার পর জ্ঞান লাভ করলেন মরিয়ম বেগম। মনিরা পাশেই ছিলো, সেদিনের ঘটনার পর একটা আনন্দ আর ব্যথা তাকে বিচলিত উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলেছিলো। কতদিন স্বামীর দর্শন লাভ তার ভাগ্যে জোটেনি। একটা দারুণ চিন্তা সদাসর্বদা মনকে অস্থির করে রেখেছিলো না জানি সে কোথায় আছে—কেমন আছে—কোনো বিপদ-আপদ ঘটেছে কিনা, এই রকম দুশ্চিন্তা অহরহ জাগতো তার হৃদয়ে। মুহূর্তের জন্য হলেও মনিরা স্বামীকে সে একনজর দেখতে পেয়েছে, সুস্থ্ আছে সে এটাই তার জীবনের পরম আনন্দ। মরিয়ম বেগমের জ্ঞান ফিরতে দেখে মনিরার মনটা কিছু আশ্বস্ত হয়ে ঝুকে পড়ে ডাকে—মামীমা....মামীমা....

মরিয়ম বেগম চোখ মেলেই বলেন—উঃ মা-মাগো অসহ্য যন্ত্রণা... বুকটা আমার জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেলো...নিজের বুকে হাত বুলান তিনি।

মনিরা লক্ষ্য করে, তার নিজের হাতখানা মামীমার বুকে বুলিয়ে দিতে থাকে। বুঝতে পারে একটা অসহ্য বেদনা তার বুকের মধ্যে গুঁমড়ে কেঁদে মরছে এবং সেই কারণেই তিনি এমন অসুস্থ্ হয়ে পড়েছেন। ডাক্তার বলেছেন মানসিক দুশ্চিন্তায় তাঁর এমন অবস্থা হয়েছে।

মরিয়ম বেগম ডাকলেন—মা—মা মনিরা।

বলো মামীমা? এই তো আমি তোমার পাশে।

মনিরা, নূর কোথায়?

সরকার সাহেবের সঙ্গে ডাক্তারের ওখানে গেছে সে। মামীমা, তুমি ভেবোনা, তোমার ছেলে ফিরে এসেছে...সে এসেছিলো...

সত্যি...সত্যি বলছিস্ মা?

হাঁ মামীমা।

আমার মনির বেঁচে আছে? ভাল আছে সে?

ভাল আছে।

তবে চলে গেলো কেন? বল্ বল্ মনিরা, সে চলে গেলো কেন?

মরিয়ম বেগমের কথায় মনিরার বুকটা হু হু করে কেঁদে উঠছিলো, কি করে বলবে সে ঐ দিনের সত্য ঘটনাটা। মনিরার দু'চোখ চাপিয়ে পানি আসছিলো, অতি কষ্টে সে নিজকে সংযত করে বলে— আবার আসবে বলে গেছে...কথাটা বলতে গলা ধরে আসে মনিরার।

মরিয়ম বেগম বলেন—আমার এ অবস্থায় সে আমাকে ছেড়ে যেতে পারলো? এত বড় হৃদয়হীন সে হতে পারলো...

মামীমা, তুমি তাকে ভুল বুঝো না, তোমার ছেলে চলে যায়নি।

তবে কোথায়—কোথায় সে? বল্ বল্ মনিরা, তবে কোথায় সে?

মামীমা, তুমি সুস্থ হয়ে উঠো সব বলবো।

কেন—কেন—কি হয়েছে তার?

কিছু না।

এমন সময় সরকার সাহেব, ডাক্তার এবং নূর প্রবেশ করে সেই কক্ষে।

মনিরা বলে উঠে—মামীমা, ডাক্তার সাহেব এসেছেন।

না না, আমার মনিরকে তোমরা এনে দাও। ডাক্তার আমি চাই না। ডাক্তার আমার জন্য লাগবে না...

সরকার সাহেব বললেন—দেখুন ডাক্তার সাহেব, ওনার সংজ্ঞা থাকাকালীন উনি সব সময় শুধু সন্তানের কথা বলবেন, কিছুতেই উনাকে প্রবোধ দেওয়া যায় না।

ডাক্তার এসে মরিয়ম বেগমের পাশে চেয়ার নিয়ে বসে বললেন —উনার অসুখটা তো ঐ একমাত্র কারণ। সন্তানের জন্য বেশি চিন্তা...

মরিয়ম বেগম বলে উঠেন—ডাক্তার সাহেব, আপনার কি সন্তান নেই, জানেন না সন্তানের জন্য মায়ের বুকে কত ব্যথা?

জানি বেগম সাহেবা, সব জানি। কিন্তু কি করবে, কোনো উপায় নেই তাকে ধরে রাখার। শুনলাম আপনার ছেলে ভালই আছে, আপনি অযথা বেশি চিন্তা করে নিজের অসুখ কঠিন করে ফেলেছেন।

কি করবো ডাক্তার সাহেব, বলুন আমি কি করবো?

ধৈর্য ধরুন।

না না, আমি পারবো না। আমার ছেলেকে আপনারা এনে দিন। মরিয়ম বেগম একে অসুস্থ, তারপর কেঁদে কেঁদে কথাগুলো বলছিলেন।

মরিয়ম বেগমের চোখের পানি দেখে সরকার সাহেব, মনিরা এবং নূর চোখের পানি ধরে রাখতে পারলো না—তারাও চোখ মুছতে লাগলো।

ডাক্তার হলেন চৌধুরী বাড়ির প্রাইভেট ডাক্তার, তিনি বহুকাল থেকে এ বাড়িতে চিকিৎসা করে আসছেন। যখন চৌধুরী সাহেব বেঁচে ছিলেন তখন থেকে, তাঁর বয়স কম নয়—প্রায় পঞ্চাশ পঞ্চান্ন হবে। এ বাড়ির সবকিছু জানেন তিনি। অনেক কথা তাঁকে হজম করতে হয় এবঙ হয়েছে। মরিয়ম বেগমের অন্তরের ব্যথা তিনি বোঝেন কিন্তু কি করবেন,এ যে কোন ওষুধ নেই। তাঁর চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে এসেছিলো, তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রুমালে চোখ মুছলেন। যদিও তিনি জানতেন এ রোগের ওষুধ নেই তবু চিকিৎসা তাঁকে করতেই হতো।

মরিয়ম বেগমকে পরীক্ষা করে ওষুধপত্রের ব্যবস্থার পর ডাক্তার সাহেব বিদায় নিলেন।

নূর আশ্চর্য হয়ে ভাবে, তার আব্বা কোথায় গেছেন, কেনই বা আসেন না। তার আব্বার জন্য দাদীমার কঠিন অসুখ হয়েছে। নূরেরও ভাল লাগে না, তার আব্বাকে কতদিন সে দেখেনি। তাদের স্কুলে সব ছেলেদের আব্বা আছে, তারা তো বাড়ি ছেড়ে কোথাও যায় না। গেলেও দু'চার দিন বাইরে থেকেই চলে আসে। নূর নিজের চোখে কত ছেলের আব্বাকে দেখেছে কিন্তু তার আব্বার মত সুন্দর কারো আব্বা নয়। নূর মনে মনে গর্ব অনুভব করেছে...আজ নূরের মনটা আব্বার জন্য হু হু করে কেঁদে ওঠে।

সে কাউকে কিছু না বলে মায়ের ঘরে প্রবেশ করে বিছানায় উবু হয়ে শুয়ে কাঁদতে থাকে। দাদীমার অবস্থা দেখে আজ যেন তারও আব্বার কথা বেশি করে মনে হচ্ছে। দাদীমার অসুখ তবু কেন তার আব্বা আসে না, অভিমানে বুক ভরে উঠে নূরের।

মনিরা এক সময় ঘরে গিয়ে দেখে নূর তার বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাঁদছে!

মনিরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ, কারণ সে নূরকে কোনোদিন এমন করে কাঁদতে দেখেনি। এসে বসে তার পাশে, স্নেহভরা কণ্ঠে বলে—নূর, কি হয়েছে তোমার?

নূর কোনো কথা বলে না।

মনিরা ওর মাথাটা তুলে নেয় কোলে। মাথায় হাত বুলিয়ে বলে—বলো. আব্বু, তুমি কেন কাঁদছো? কি হয়েছে তোমার বলো?

আম্মি, তুমি বলো—আব্বা কেন আসে না?

চমকে উঠে মনিরা। এতক্ষণে সে বুঝতে পারে কেন নূর এভাবে একা একা শুয়ে শুয়ে কাঁদছে।

মনিরার দু'চোখ ছাপিয়ে পানি আসে, এতটুকু ছেলের প্রশ্নের জবাব সে দিতে পারে না। আজ নয়, এমনি বহুদিন নূর তাকে ধরে বসেছে, বলোনা আম্মি আব্বা কেন আসেনা? সবার আব্বা বাসায় থাকে, আমার আব্বা কেন চলে যায়? কোথায় যায় আমার আব্বা বলোনা...কিন্তু মনিরা কোনোদিন সন্তানের প্রশ্নের জবাব দিতে পারেনি। কিই বা জবাব দেবে সে।

আজও মনিরা কোনো জবাব দিতে পারে না, নীরবে অশ্রু বর্ষণ করে চলে।

নূর মাকে নীরব থাকতে দেখে ব্যাকুল কণ্ঠে বলে—আম্মি, সত্যি তুমি বলবে আব্বা কেন আসে না আর কোথায়ই বা গেছে? বলো আম্মি।

বুকের মধ্যে টেনে নেয় মনিরা সন্তানকে। ঠোঁট কামড়ে উচ্ছ্বসিত কান্নাকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করে। আজ দশ বছর হলো পরিচয় তার স্বামীর সঙ্গে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে স্বামীকে সে নিজেও তেমন করে নিশ্চিতভাবে পাশে পায়নি। তার নিজের মনেই কি কম অনুযোগ তাঁর স্বামী সম্বন্ধে কিন্তু কে দেবে তার জবাব। সেও কি অন্যান্য মেয়ের মত স্বামীকে একান্ত পাশে পাবার জন্য উন্মুখ নয়? কত আকাশ কুসুম স্বপ্ন সাধ তার মনে জাগে। স্বামীকে সর্বক্ষণ পাশে পাবার জন্য মন তার আকুলি বিকুলি করে। কত ব্যথা জমাট বেঁধে আছে তার এ বুকে। মনিরা পুত্রের মাথায় হাত বুলিয়ে বলে—তোমার আব্বা মানুষ নয় নূর, পাষাণ...তার মধ্যে প্রাণ নেই, থাকলে সে এমন করে দূরে থাকতে পারতো না।

আম্মি, তুমি জানোনা আব্বা কোথায় গেছে?

না, জানি না।

এতবড় একটা মিথ্যা বলতে মনিরার বুকটা ধক করে উঠে যেন। শুধু আজ নয়, সন্তানের কাছে মা হয়ে তার পিতা সম্বন্ধে কত মিথ্যাই না বলতে হয়েছে আর হচ্ছে।

নূর বুঝতে পারে, তার আব্বা সম্বন্ধে কোনো কথা মাকে জিজ্ঞাসা করলে মুখখানা তার কেমন যেন নিস্প্রভ হয়ে উঠে। কোনো সময় ঠিক মত জবাব দিতে পারে ন। নূরের কচি মনে তাই দারুণ আঘাত লাগে, কেন তার আম্মা আব্বার কথা বললে জবাব দেয় না। নূর আজ মায়ের চোখে পানি দেখে আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা করে না।

মনিরা কিছুক্ষণ নূরকে বুকে চেপে ধরে নিশ্চুপ বসে থাকে, তারপর ধীরে ধীরে এক সময় শান্ত হয়ে আসে তার মন। বলে মনিরা—বাবা, তোমার দাদীমার কাছে যাও।

নূর কোন আপত্তি করে না, সে উঠে চলে যায় দাদীমার ঘরে।

মরিয়ম বেগম কখনও একটু সুস্থবোধ করেন আবার কখনও সংজ্ঞা হারান। তাঁর অসুস্থতার জন্য চৌধুরী বাড়িতে কোনো শান্তি নেই। নূরের মনেও ছিলো না। ন'বছর বয়সে অনেক বুঝতে শিখেছে সে, তার আব্বার জন্য দাদীমার মনেও যে একটা ভীষণ চিন্তা সব সময় বিরাজ করে, এটা সে জানে এবং বোঝে।

কতদিন নূর দাদীকেও জিজ্ঞাসা করেছে, দাদী আম্মা, আর সবার আব্বার মত আমার আব্বা কেন আমাদের বাড়ি থাকে না?

দাদী মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন, হয়তো বা কোনোদিন জবাব দিয়েছেন, আমাদের আর একটা বাড়ী আছে, সেখানে সে থাকে।

প্রশ্ন করেছিলো নূর—আব্বা সেখানে কি করে?

হঠাৎ এ প্রশ্নে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন তিনি, কি জবাব দেবেন তবু আমতা আমতা করে বলেছিলেন—কাজ করে।

কাজ...কি কাজ করে বলোনা দাদী আম্মা?

ঠিক আমি জানি না দাদু ভাই।

আব্বা এলে জিজ্ঞাসা করবো। বলেছিলো নূর।

কিন্তু আব্বাকে সে তেমন করে কোনোদিন জিজ্ঞাসা করেনি, হয়তো বা আনন্দে আত্নহারা হয়ে ভুলেই গেছে সে কথা।

নূর দাদীমার শিয়রে এসে দাঁড়ায়।

দাদীমা দুচোখ বন্ধ করে উঃ উঃ শব্দ করছেন আর মাঝে মাঝে বলছেন—মনির বাপ আমার, কেন এসেছিলি—আমাকে একনজর দেখা না দিয়েই চলে গেলি......ওরে নিষ্ঠুর......এত পাষাণ তুই......

নূর নীরবে শুনছিলো, একটু আগে তার আব্বা সম্বন্ধে মাকেও সে ঐ কথা বলতে শুনেছে—সে মানুষ নয়, পাষাণ তার মধ্যে প্রাণ নেই...

নূরের মনটা কেমন যেন হয়ে যায়, ভাবে কই তার আব্বাতো মোটেই হৃদয়হীন পাষাণ নয়। কত হাসিখুশি আর সুন্দর তার আব্বা। কত আদর, কত স্নেহ করেন তিনি তাকে। এবার এলে সব কথা বলবে তার আব্বাকে কিন্তু কবে কখন আসবেন তিনি কে জানে।

নূর ডাকলো—দাদী আম্মা।

মরিয়ম বেগম চোখ মেললেন—দাদু—দাদু এসো, কোথায় ছিলি দাদু এতক্ষণ?

আম্মির ঘরে।

বস দাদু আমার পাশে।

নূর মরিয়ম বেগমের পাশে এসে বসে।

মরিয়ম বেগম তাঁর জীর্ণ হাতখানা দিয়ে নূরের হাতখানা তুলে নেন হাতের মধ্যে—দাদু।

নূরের চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ে মরিয়ম বেগমের হাতের উপর।

মরিয়ম বেগম বলেন—দাদু তুই কাঁদছিস? কেন কাঁদছিস্ দাদু?

দাদীর কথায় নূরের অশ্রু বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মত নেমে আসে—ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে নূর।

মরিয়ম বেগম বলেন—একি দাদু, কাঁদছিস কেন?

দাদীমা, তুমি মরে যাবে তখন কি হবে বলো? কেউ নেই আমাদের। শামীম, সেলিম, হারুন এদের সবার আব্বা আছে, আমার আব্বাও নেই...

ছিঃ দাদু কে বললো তোমার আব্বা নেই?

তুমি যে আব্বার জন্য কেঁদে কেঁদে মরতে বসেছো? একটু আগেও বললে মনির নিষ্ঠুর পাষাণ...আমি জানি, তুমি আব্বাকে না দেখতে পেয়ে সব সময় চিন্তা করো তাই তোমার এমন কঠিন অসুখ হয়েছে।

হাঁ দাদু, ঠিক বলেছিস্। দাদু, তোর আব্বা কি সত্যি সত্যি এসেছিলো?

আব্বা এসেছিলো এ কথা তোমায় কে বললো দাদীআম্মা?

তোর মা বলেছে। ওরে তোর মা বলেছে...

আম্মি বলেছে আমার আব্বা এসেছিলো? কই, আমাকে তো বলেনি আম্মি। আমার আব্বা এসেছিলো?

তাই বলছে ওরা।

তুমি দেখোনি আব্বাকে?

না, না আমি তাকে দেখিনি দাদু, তাকে দেখিনি। তুইও দেখিস্‌নি। তবে কি তোর আম্মি মিথ্যা কথা বলেছে। আমার অসুখ তাই মিথ্যা কথা বলে আমাকে প্রবোধ দিচ্ছে। দাদু আমি যেন অসুখে অজ্ঞান ছিলাম তুইতো ছিলি......

মরিয়ম বেগম অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন তাই এতগুলো কথা একসঙ্গে বলতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠছিলেন।

নূর দাদীমার মাথার চুলে হাত বুলিয়ে বললো—দাদী আম্মা, আমি আম্মির কাছে জেনে নিচ্ছি সত্যি আব্বা এসেছিলেন কিনা। যদি আব্বা এসেইছিলেন তবে আমি তাঁকে দেখিনি কেন? তুমি একটু চুপচাপ শুয়ে থাকো, আমি একছুটে আম্মিকে জিজ্ঞাসা করে আসছি।

কথাটা বলেই একছুটে চলে যায় নূর।

মনিরা সবেমাত্র রান্নাঘরের দিকে এগুচ্ছিলো, ঠিক ঐ সময় নূর এসে দাঁড়ায়—আম্মি, সত্যি করে বলো তো আমার আব্বা এসেছিলো কিনা?

পুত্রের মুখে হঠাৎ এ কথা শুনে প্রথমে চমকে উঠলো মনিরা, ঢোক গিলে বললো—এ কথা তোমাকে কে বললো?

নূর চট্ করে জবাব দিলো—দাদী আম্মা।

একটু হাসবার চেষ্টা করে বলে মনিরা—তাঁর অসুখ, তিনি কি করে দেখলেন তোমার আব্বা এসেছিলো?

তুমি নাকি দাদী আম্মাকে বলেছো?

মনিরার মুখখানা নিষ্প্রভ হয়ে যায়, বলে সে—আব্বু, তোমার দাদীমার অসুখ, তাই তাকে প্রবোধ দেবার জন্য বলেছিলাম। জানো আব্বু তোমার দাদীর অসুখ তাই বুঝলে তাঁকে মিথ্যা বলেছিলাম...

এতবড় একটা মিথ্যা বলতে মনিরার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছিলো তবু না বলে উপায় নেই। মা হয়ে আর কতদিন তার চলবে এ মিথ্যা বলা।

নূরকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে নীরবে ওর মাথায় হাত বুলায় মনিরা।

❑

মিঃ আহসান হঠাৎ উধাও হলেন তারপর তাঁর কোনো খোঁজখবর নেই, বিশেষ করে পুলিশ মহল তাঁর এ অন্তর্ধানে বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলো। লোকটা হঠাৎ গেলো কোথায়? নিশ্চয়ই তাঁকে হত্যা করা হয়েছে, পুলিশ মহলের এই ধারণা একেবারে সুদৃঢ় হলো।

মিসেস আহসান এবং হুসনার মনে আশা ছিলো, মিঃ আহসান ফিরে আসবেন কিন্তু সপ্তাহ দু'যখন চলে গেলো তবু এলো না তিনি, তখন তাঁরা বিশেষভাবে ভেঙ্গে পড়লেন। পুলিশ মহলেও সাড়া পড়ে গেলো এবং সমস্ত কান্দাই শহরে মিঃ আহসানের সন্ধান চললো।

গোয়েন্দা বিভাগ ছড়িয়ে পড়েলো শহরময়, কোথাও কেউ আহসান সম্বন্ধে আলোচনা করে কিনা কিংবা তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয় কিনা।

সেদিন পুলিশ অফিসে এসে হাজির হলো মিঃ ফিরোজ রিজভীর প্রধান পার্টনার মিঃ গিয়াস উদ্দিন।

পুলিশ অফিসে তখন ছিলেন মিঃ হেলালী। নতুন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, অল্পদিন হলো তিনি কান্দাই হীরু জেলার পুলিশ অফিসের ভার নিয়ে এসেছেন। সেখান থেকে তাঁকে পাঠানো হয়েছে কান্দাই অফিসে মাত্র কয়েক মাসের জন্য। অবশ্য তিনি ইচ্ছা করেই কান্দাই সদর পুলিশ অফিসে এসেছেন। কেননা, দস্যু বনহুর সমন্ধে মিঃ হেল্যালীর বিরাট কৌতুহল রয়েছে। সেদিন দস্যু বনহুর শের আলী বেশে মিঃ ইয়াসিনকে সঙ্গে নিয়ে যাবার পর হঠাৎ শের আলীকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় পাওয়া যায় তারই শয়নকক্ষে খাটিয়ার নিচে। হাত দু'খানা পিছমোড়া করে বাঁধা, মুখে কাপড় গোঁজা, পা দুটোও শক্ত দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিলো।

অপর একজন হাওলদার কোনো কাজে ঐ কক্ষে প্রবেশ করে একটা গোঙানির শব্দ শুনতে পায়, তারপর সন্ধান নিয়ে জানতে পারে শব্দটা ঠিক খাটিয়ার তল থেকে আসছে। যেমনি সে উবু হয়েছে অমনি তার নজর পড়েছে খাটিয়ার তলায় প্রায় উলঙ্গ শের আলী উপুড় হয়ে পড়ে থেকে গোঙাচ্ছে। তাড়াতাড়ি সে বের করে আনে শের আলীকে, তারপর ওকে জিজ্ঞাসা করে—শের আলী, তোমার এ অবস্থা কেন?

শের আলী যা বলেছিলো সে কথা শুনে হাওলদার অবাক। শের আলী বলে—আমি রাতের ডিউটিতে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছি, এমন সময় জমকালো পোশাক পরা একটা লোক ঘরে ঢুকলো। আমি তখন মাজায় বেল্ট কষছিলাম। জমকালো মূর্তিটা এগিয়ে আসছে দেখে আমি যেমনি খাটিয়ায় ঠেশ দেওয়া রাইফেলে হাত দিতে যাবো অমনি গম্ভীর গলায় জমকালো মূর্তি বলে উঠলো—খবরদার, রাইফেলে হাত দিওনা। আমি তাকিয়ে দেখলাম লোকটার মুখের নিচের অংশ কালো কাপড়ে ঢাকা, তার চোখ দুটো শুধু দেখা যাচ্ছে, আর দেখা যাচ্ছে তার হাতের রিভলভার। রিভলভারের মুখটা ঠিক আমার বুক লক্ষ্য করে উদ্যত রয়েছে। আমি শিউরে উঠলাম রাইফেলে হাত দেওয়া তো দূরের কথা, আমি আমার

কোমরের বেল্‌টাও আর বাঁধতে পারলাম না। জমকালো মূর্তি ততক্ষণে এসে আমার বুকে রিভলভার চেপে ধরেছে তখন আমার নড়াচড়া করবার কোনো উপায় ছিলো না। জমকালো মূর্তির আচরণে আমি আশ্চর্য এবং ভীত হয়ে পড়েছিলাম, বললাম তুমি কে আর কিইবা চাও? লোকটা জবাব দিলো—আমি কিছু চাই না, শুধু তোমার দেহের ঐ পোশাকটা চাই। অবাক কণ্ঠে বলেছিলাম, পোশাক দিয়ে কি করবে? চোর-ডাকু তারা টাকা-পয়সা, সোনাদানা চায় আর তুমি চাইছো পোশাক? জমকালো মূর্তি হেসে বলেছিলো, ওসবে আমার কোনো প্রয়োজন নেই, তোমার পোশাকটা পেলেই খুশি হবো। কিন্তু আমি তাকে পোশাক দিতে রাজি হইনি, কারণ সরকারি ড্রেস আমি একজন অচেনা লোককে দিতে পারি না। যখন আমি পোশাক দিতে নারাজ হলাম তখন লোকটা আমাকে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেললো তারপর আমার নাকে একটা রুমাল চেপে ধরলো। লোকটার দেহে সেকি সাংঘাতিক শক্তি, আমি কিছুতেই পেরে উঠলাম না, সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললাম। যখন জ্ঞান হলো দেখি খাটিয়ার তলায় পড়ে আছি। মুখে কাপড় গোঁজা, তাই চিৎকার করতে পারলাম না, পড়েই আছি...

সব শুনে হাওলদারের চক্ষুস্থির, সে শের আলীকে একটা লুঙ্গি পরতে দিয়ে ছুটলো পুলিশ অফিসে সংবাদ দিতে।

ততক্ষণে মিঃ ইয়াসিন তাঁর দলবল নিয়ে চৌধুরী বাড়ি থেকে ফিরে এসেছেন পুলিশ অফিসে। অফিসে প্রচার হয়ে গেছে এ কথাটা। দস্যু বনহুর শের আলী বেশে মিঃ ইয়াসিন সহ চৌধুরী বাড়ি গিয়েছিলো এবং সেখান থেকে সে অন্তর্ধান হয়েছে।

শের আলীর উদ্ধার ঘটনাটা যদি কয়েক ঘন্টা আগে ঘটতো তাহলে হয়তো দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারে কিছুটা উপকার হতো। শের আলীর উদ্ধার ঘটনাটা ঘটেছিলো রাত্রির শেষভাগে ভোর হবার কিছু পূর্বে।

মিঃ হেলালী সব শোনার পর দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের উৎসাহী হয়ে উঠেছেন। তিনি একজন তরুণ পুলিশ সুপার। দেহের উষ্ণ রক্তের প্রবাহ, মনে অসীম বল। সি এস পি পাশ করার পর তিনি সবেমাত্র কয়েক বছর

হলো চাকরিতে জয়েন করেছেন। উদারচেতা এবং ন্যায়নীতিধর্মী লোক। অন্যায় তিনি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারেন না।

মিঃ হেলালী কান্দাই পুলিশ অফিসের চার্জ হাতে নিয়েই মেতে উঠেছেন দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের জন্য। প্রথমেই তিনি শের আলীকে ডেকে সেই রাতের ঘটনাটা বিস্তারিত শুনে নিলেন। মিঃ হেলালী বুঝতে পারলেন দস্যু বনহুরকে যতখানি সহজ তিনি মনে করেছেন ঠিক ততখানি নয়।

পুলিশ অফিসে বসে তিনি এবং আরও কয়েকজন পুলিশ অফিসার দস্যু বনহুর সম্বন্ধে পুলিশ রিপোর্টগুলো মনোযোগ সহকারে দেখছিলেন ঠিক ঐ সময় মিঃ গিয়াস উদ্দিন এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে বেশ কিছুটা উত্তেজিত মনে হচ্ছিলো।

অন্যান্য পুলিশ অফিসারের সুপরিচিত হলেও মিঃ হেলালীর মোটেই পরিচিত নয় মিঃ গিয়াস উদ্দিন।

মিঃ হেলালী তাঁর সম্মুখস্থ রিপোর্টের খাতাগুলো থেকে চোখ তুলে তাকালেন।

মিঃ নিজাম উদ্দিন থানা অফিসার, তিনি উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানালেন মিঃ গিয়াস উদ্দিনকে এবং মিঃ হেলালীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

মিঃ গিয়াস উদ্দিনের মুখ স্বাভাবিক ছিলো না, তিনি ব্যস্ততার সঙ্গে পরিচয় শেষ করে নিয়ে বললেন—স্যার, একটা বিরাট দুঃসংবাদ আছে।

মিঃ হেলালী চোখ দুটো তুলে ধরলেন মিঃ গিয়াস উদ্দিনের মুখে; বললেন—বসুন!

মিঃ গিয়াস উদ্দিন আসন গ্রহণ না কারেই উত্তেজিতভাবে বললেন —স্যার, সর্বনাশ হয়েছে। কোরা থেকে আমাদের কোম্পানীর পাঁচ বাক্স মাল এসেছে।

গিয়াস উদ্দিনের কথায় বলেন মিঃ হেলালী—মাল এসেছে এটা এমন কি দুঃসংবাদ হতে পারে মিঃ গিয়াস উদ্দিন?

স্যার, আপনি চলুন এবং দেখুন কি বীভৎস, কি ভয়ঙ্কর ঘটনা...

বলুন কি হয়েছে? জিজ্ঞাসা করলেন মিঃ হেলালী।

অন্যান্য পুলিশ অফিসার বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে আছেন মিঃ গিয়াস উদ্দিনের মুখে, কি এমন দুঃসংবাদ যা তিনি সহজে বলতে পারছেন না।

বললেন গিয়াস উদ্দিন—স্যার চলুন, আপনি দেখুন কি ভয়ঙ্কর ঘটনা...

তবু কিছু বলবেন তো?

লাশ! পাঁচ বাক্সের মধ্যেই লাশ।

লাশ?

হঁ স্যার, মিঃ ফিরোজ রিজভী ও আমাদের আরও চারজন সহকর্মীর লাশ...

বলেন কি মিঃ গিয়াস উদ্দিন, ফিরোজ রিজভীর লাশ বাক্সে। এক সঙ্গে বলে উঠেন পুলিশ অফিসারগণ।

মিঃ হেলাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তুলে ধরলেন—কি বললেন, বাক্সে ফিরোজ রিজভীর লাশ রয়েছে?

শুধু ফিরোজ রিজভীর লাশই নয় স্যার, তাঁর সঙ্গে যে চারজন ছিলেন তাঁদেরও লাশ বাক্সে রয়েছে। স্যার, দেরী করবেন না চলুন।

মিঃ হেলালী সঙ্গে সঙ্গে ফোন করলেন মিঃ জাফরী এবং মিঃ জায়েদীর কাছে।

মিঃ গিয়াস উদ্দিনের চোখেমুখে ভয়ভীতি আর দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটে উঠেছে। তিনি আসন গ্রহণ না করে পায়চারী করে চললেন অস্থিরভাবে।

সমস্ত পুলিশ অফিসে একটা গুঞ্জনধ্বনি উঠলো।

অল্পক্ষণেই এসে উপস্থিত হলেন মিঃ জাফরী এবং মিঃ জায়েদী।

মিঃ হেলালী ঘটনাটা জানালেন।

মিঃ গিয়াস উদ্দিন, মিঃ জাফরী এবং মিঃ জায়েদীর সুপরিচিতি—ফিরোজ রিজভীর প্রধান সহকারী ও পার্টনার, এ কথা সবাই জানেন।

গিয়াস উদ্দিন প্রায় কেঁদে ফেলে বিস্তারিত ঘটনাটা বললেন মিঃ জাফরী এবং জায়েদীর কাছে। কোরা থেকে জম্বু হয়ে তাদের কারবারের মাল এসেছে। মালের বাক্স খোলার সঙ্গে সঙ্গে তারা হতবাক হয়ে গেছে, কারণ

মালের বাক্সে রয়েছে কয়েকটি মৃতদেহ। মৃত দেহগুলো এখনও বাক্সেই আছে, সেগুলো বাক্সের বাইরে বার করা হয়নি।

মিঃ জাফরী, মিঃ হেলালী এবং মিঃ জায়েদী ও মিঃ গিয়াস উদ্দিন চললেন কান্দাই ফিরুজা বন্দরের নিকটে দিরু ফার্মে।

গাড়ি পৌঁছতেই তাঁরা লক্ষ্য করলেন দিরু ফার্মের সম্মুখে বহু লোকের ভিড় জমে গেছে।

দিরু ফার্ম ফিরোজ রিজভী ও তার সহকারীদের প্রকাশ্য ব্যবসাকেন্দ্র। এখানে বিদেশ থেকে বিভিন্ন মাল আমদানী হয় এবং সেই সম মাল তাদের ব্যবসাকেন্দ্রে চালান যায়। এইসব মালের মাধ্যমে চলে চোরাচালানী ব্যবসা। সহজ চোখে কেউ বুঝতে পারবে না দিরু ফার্মের অভ্যন্তরে রয়েছে কি ভয়ঙ্কর রহস্যপূর্ণ কারসাজি।

দিরু ফার্মে প্রায় দু'শত কর্মচারী কাজ করে। বিরাট জায়গা নিয়ে সুউচ্চ প্রাচীরে ঘেরা এই দিরু ফার্ম। প্রাচীরের উপরিভাগে রয়েয়ে সুতীক্ষ্ণ ঝক্ঝকে কাঁচের টুকরো, কারো সাধ্য নেই প্রাচীর টপকে ওপারে যায়।

সেই দিরু ফার্মের লৌহফটক খোলা।

ভিতরে একরাশ লোক ভিড় জমিয়েছে।

দিরু ফার্মের পাহারাদগণ কিছুতেই এই লোকজনকে ভিতরে প্রবেশে বাধা দিতে পারছে না।

এমন সময় মিঃ জাফরী তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁদের গাড়ির পিছনেই ছিলো মিঃ গিয়াস উদ্দিনের গাড়ি। মিঃ গিয়াস উদ্দিন দিরু ফার্মের দ্বিতীয় অধিনায়ক। প্রধান অধিনায়ক ছিলেন মিঃ ফিরোজ রিজভী।

গাড়ি দু'খানা এগিয়ে আসতেই গেটের পাশে দারোয়ানদ্বয় সেলাম জানালো।

গাড়ি দু'খানা দিরু ফার্মে প্রবেশ করলো!

গাড়ি থামতেই নেমে পড়লেন মিঃ জাফরী, মিঃ জায়েদী, মিঃ হেলালী এবং গিয়াস উদ্দিন।

তাঁরা দেখলেন দিরু ফার্মের প্রাঙ্গণে একটি গাড়ি থেমে আছে এবং তার পাশেই পাশাপশি কয়েকটা বাক্স রয়েছে। বাক্সগুলোর চারপাশে ভিড় জমিয়ে দেখছে অনেকগুলো লোক।

মিঃ জাফরী ও তার সঙ্গী পুলিশ অফিসারগণ এগুতেই বাক্সগুলোর পাশ থেকে কিছু দূরে সরে দাঁড়ালো জনগণ।

কয়েকজন পুলিশ দাঁড়িয়ে ছিলো, তারা মিঃ জাফরী ও তাঁর সঙ্গীদের সেলুট করে সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

মিঃ জাফরী, মিঃ হেলালী, মিঃ জায়েদী তিনজন পুলিশ অধিনায়ক এসেছেন, কারণ মিঃ ফিরোজ রিজভী সাধারণ লোক ছিলেন না, তিনি পুলিশ মহলের একজন সুপরিচিত এবং স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন, কাজেই তাঁরা না এসে পারলেন না।

কয়েকজন পুলিশ এবং সাধারণ পুলিশ অফিসারও এসেছেন তাঁদের সঙ্গে। মিঃ জাফরীর নির্দেশে বাক্সগুলোর মুখের তক্তা সম্পূর্ণ সরিয়ে ফেলা হলো। তারা বিস্ময়ভরা চোখে দেখলেন, এক একটি বাক্সের মধ্যে এক একটা লাশ রাখা হয়েছে। প্রত্যেকটা লাশকে বাক্সে চিৎ করে শোয়ানো হয়েছে। কিভাবে হত্যা করা হয়েছে বোঝা যাচ্ছে না এখনও।

মিঃ জাফরী লাশগুলো বাক্স থেকে বের করার নির্দেশ দিলেন।

দু'জন পুলিশ লাশগুলো বের করে শুইয়ে রাখলো দিরু ফার্মের প্রাঙ্গণে। সবাই যেন হতবাক হয়ে পড়েছে, সবার চোখেমুখেই আতঙ্কের ছায়া। সবাই জানে, মিঃ ফিরোজ রিজভী এবং তাঁর চারজন সঙ্গী গত দু'সপ্তাহ হলো গোপনে কান্দাই ত্যাগ করে হিন্দল অভিমুখে রওয়ানা দিয়েছিলেন কিন্তু তাঁরা চলে যাবার পর থেকে তাঁদের আর কোনোরকম সংবাদ কান্দাইবাসী জানে না। এমন কি তাঁর বিশিষ্ট সহকারী এবং পার্টনার মিঃ গিয়াস উদ্দিনও জানেন না মিঃ ফিরোজ রিজভী তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে কোথায় অবস্থান করছেন।

লাশগুলো বের করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের পিঠের তলায় দেখা গেলো জমাট রক্তের চাপ।

মিঃ জাফরী লাশগুলো উল্‌টানোর নির্দেশ দিলেন।

লাশ উল্‌টানোর সঙ্গে সঙ্গেই সকলের চক্ষুস্থির। প্রত্যেক লাশের পিঠে এক একটি বিরাট তারকাঁটা পেরেক পোঁতা রয়েছে। পেরেকের সঙ্গে একটি টিনের চাকতি আটকানো।

মিঃ জাফরী ঝুকে পড়লেন, যদিও চাকতিগুলোতে রক্ত জমাট বেঁধে আছে তবু বোঝা যাচ্ছে তাতে কিছু লিখা আছে।

একসঙ্গে সবাই চাকতির লেখাগুলো পড়ার চেষ্টা করলেন কিন্তু সহসা লেখা পড়া গেলো না।

মিঃ হেলালী বললেন—স্যার, লাশের পিঠ থেকে পেরেক উঠিয়ে চাকতি খুলে দেখা দরকার। চাকতিতে কি লেখা আছে বোঝা যাবে।

তাই করা হলো, লাশগুলোর পিঠ থেকে পেরেক উঠিয়ে নেবার জন্য বলা হলো।

লাশগুলো থেকে উৎকট পচা গন্ধ নির্গত হচ্ছিলো, তাই সকলে নাকে রুমাল চাপা দিয়ে দেখছিলেন।

একজন ডোমকে বলা হলো লাশের পিঠ থেকে পেরেকগুলো তুলে নেওয়ার জন্য।

ডোম পুলিশ অফিসারদের আদেশ অনুযায়ী লাশগুলোর পিঠ থেকে পেরেক সহ চাকতি তুলে নিলো। কি আশ্চর্য, পেরেকগুলো প্রায় বিশ ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা হবে। ভীষণ শক্তি দিয়ে তুলে নেওয়া হলো পেরেকগুলো।

মিঃ জায়েদী বললেন—আশ্চর্য উপায়ে এদের হত্যা করা হয়েছে, ছোরা বা পিস্তল দিয়ে নয়, লৌহ পেরেক দিয়ে।

মিঃ হেলালী বললেন—শুধু ঠান্ডা পেরেক নয়, পেরেকগুলো এদের পিঠে বিদ্ধ করার পূর্বে অগ্নিদগ্ধ করে নেওয়া হয়েছিলো।

মিঃ জাফরী বললেন—হাঁ মিঃ হেলালী, আপনার অনুমান মিথ্যা নয়। পেরেকগুলোর অবস্থা দেখে তাই মনে হচ্ছে। এত লম্বা পেরেক ইতিপূর্বে আমরা কমই দেখেছি। নিন, এবার চাকতিতে কি লেখা আছে দেখা যাক।

ডোম চাকতি খুলে নিলো পেরেক থেকে এবং পানিতে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে মিঃ জাফরীর হাতে দিলো।

মিঃ জাফরী উচ্চস্বরে পড়লেন—

১ নং জল্লাদ
তার মহৎ কর্মের জন্য তাকে
পুরস্কার দেওয়া হলো।
—দস্যু বনহুর।

দ্বিতীয় চাকতি হাতে নিয়ে অবাক হলেন মিঃ জাফরী, এ চাকতি ২নং না হয়ে এটা ৩ নং ছিলো এবং পূর্ব চাকতির মতই এটাতেও লেখা ছিলো,

৩নং জল্লাদ
তাকে তার কর্মের জন্য সমুচিত
পুরস্কার দেওয়া হলো।
—দস্যু বনহুর।

এরপর ৪ নং ৫ নং কিন্তু ২ নং গেলো কোথায়? মিঃ গিয়াস উদ্দিন বললেন—স্যার, মিঃ ফিরোজ রিজভীর সঙ্গে এরা চারজন গিয়েছিলো কিন্তু ২ নং না লিখে দস্যু বনহুর দ্বিতীয় জনের পিঠে ৩ নং চাকতি মেরেছে কেন বুঝতে পারছি না?

মিঃ হেলালী বললেন...দস্যু বনহুর সম্বন্ধে আমার ধারণা ছিলো সে শুধু দস্যুতায়ই অভিজ্ঞ কিন্তু এখন দেখছি সে একজন সূতীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান, কারণ সে জানে ওদের মধ্যে ২ নং জল্লাদ নেই। কথাটা বলেই মিঃ হেলালী তাকালেন মিঃ গিয়াস উদ্দিনের মুখে, তারপর মিঃ জাফরীর দিকে।

মিঃ গিয়াস উদ্দিন ঢোক গিলে বললেন—দস্যু বনহুর কাকে তার ২ নং শিকারে পরিণত করবে কে জানে!

মিঃ জাফরী বেশ কিছুক্ষণ গম্ভীর মুখে চিন্তা করে বললেন—আমি যখন খবর শুনলাম তখনই বুঝতে পেরেছি এটা দস্যু বনহুরের কাজ ছাড়া কারও নয়। মিঃ ফিরোজ রিজভী দেশত্যাগ করেও নিস্তার পেলেন না।

মিঃ জায়েদী বললেন—মিঃ গিয়াস উদ্দিন, আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করবো, সঠিক জবাব দেবেন তো?

মিঃ গিয়াস উদ্দিনের মুখমন্ডল মড়ার মুখের মত ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। তারই সহকারীদের নির্মম পরিণতি তাকে একেবারে ভীত আতঙ্কিত করে তুলেছে। আজ কোটি কোটি টাকার মালিক মিঃ ফিরোজ রিজভীর বিকৃত লাশের দিকে তাকিয়ে গিয়াস উদ্দিন যেন প্রাণহীনের মত অসাড় হয়ে পড়েছেন। মিঃ জায়েদীর কথায় বললেন— দেবো স্যার।

মিঃ জাফরী লাশগুলো ভালো করে পরীক্ষা করে দেখছিলেন। মিঃ হেলালী বললেন—দস্যু বনহুর এদের পেরেক বিদ্ধ করে হত্যা করেছে। পেরেকগুলো এত বেশি লম্বা যার দ্বারা এদের হৃৎপিন্ড ভেদ হয়ে গেছে এবং কঠিন শাস্তি ভোগ করার পর মৃত্যুবরণ করেছে।

মিঃ জাফরী বললেন—হাঁ, আপনি ঠিক বলেছেন মিঃ হেলালী, দস্যু বনহুর এবার তার শিকারে নতুন অস্ত্র ব্যবহার করেছে। পেরেকগুলো অত্যন্ত গরম থাকায় যদিও রক্ত দেহের ভিতর জমাট বেঁধে গেছে কিন্তু গাড়ির ঝাঁকুনিতে কালো রক্ত বেরিয়ে এসেছে। ...

লাশগুলো সম্বন্ধে নানাজনের নানারকম কানাঘুষা করতে শুরু করে দিয়েছে। মুহূর্তে শহরময় ছড়িয়ে পড়েলো দস্যু বনহুরের এই অদ্ভুত হত্যাকান্ডের কথা।

মিঃ জাফরী লাশ মর্গে পাঠানোর পূর্বে আরও একবার পরীক্ষা করে দেখার জন্য পুলিশ অফিসে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তারপর মিঃ গিয়াসউদ্দিন সহ দিরু ফার্মের একটি কক্ষে এসে বসলেন।

ততক্ষণে লাশগুলো পুনরায় বাক্সে উঠানো শুরু হয়েছে।

ভিড়ও কমে গেছে অনেক।

সকলের চোখেমুখে আতঙ্কের ছাপ ফুটে উঠেছে, কারণ যাঁদের আজ হত্যা করা হয়েছে তাঁরা কান্দাইবাসীর চোখে মন্দ লোক ছিলেন না। দস্যু বনহুর এই মহৎ লোকদের কি কারণে হত্যা করলো সবাই ভেবে অস্থির হলো এবং ভয়-বিহ্বল হয়ে পড়লো।

মিঃ জাফরী বললেন—মিঃ জায়েদী, আপনিই প্রশ্ন করুন।

মিঃ জায়েদী এবার জিজ্ঞাসা করলেন মিঃ গিয়াস উদ্দিনকে— আচ্ছা মিঃ গিয়াস উদ্দিন, আপনাদের বন্ধু এবং পার্টনার মিঃ ফিরোজ রিজভী কান্দাই ত্যাগ করার পর তিনি কোথায় আছেন আর কেমন আছেন, একথা আপনাকে জানিয়েছিলেন কি?

না, তিনি জানাননি। অবশ্য তিনি বলে গিয়েছিলেন তিনি যেখানেই থাকুন না কেন তাঁদের কুশলাদি জানাবেন এবং ব্যবসা ঠিকমতই চালিয়ে যাবেন, কিন্তু তিনি কান্দাই ত্যাগ করার পর তাঁর কোনো চিঠিপত্র বা টেলিগ্রাফ কিংবা ফোন পাইনি।

তিনি কোথায় ছিলেন তাও তাহলে আপনি জানতেন না?

না স্যার। তবে জানতাম মিঃ ফিরোজ রিজভী ও আমাদের আরও চারজন একই সঙ্গে আছেন এবং তাঁরা হিন্দলে আছেন।

মিঃ জাফরী বলে উঠলেন—কিন্তু আপনাদের মাল এসেছে কোরা শহর থেকে, তাই নয় কি?

হ্যাঁ স্যার, কোরা শহরই আমাদের ব্যবসার দ্বিতীয় কেন্দ্রস্থল।

প্রথম কেন্দ্রস্থল হলো কান্দাই শহর, তাই নয় কি? বললেন মিঃ হেলালী।

মিঃ গিয়াস উদ্দিন বললেন—হাঁ, আপনি ঠিক, বলেছেন, আমাদের প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রস্থল হলো কান্দাই শহরে।

পুনরায় প্রশ্ন করলেন মিঃ হেলালী— মিঃ গিয়াস উদ্দিন, আপনাদের ব্যবসা কেন্দ্রটি কতদিনের প্রতিষ্ঠিত জানতে পারি কি?

হাঁ স্যার বলছি, প্রায় সাত বছর তবে এত বড় ছিলো না, দু'বছর হলো আমরা...

এতবড় হয়ে উঠেছেন, এইতো?

অনেক শ্রমের পরিবর্তে আমরা এত উন্নতি লাভে সক্ষম হয়েছিলাম।

মিঃ জায়েদী বলে উঠলেন—দস্যু বনহুরের চোখে আপনাদের উন্নতি সাধন সহ্য হলো না—কি বলেন; তাই না?

হাঁ স্যার, দস্যু বনহুর আমাদের সর্বনাশ করলো। সব আশা-আকাঙ্ক্ষা ধুলিসাৎ হয়ে গেলো...প্রায় কেঁদে ফেললেন মিঃ গিয়াস উদ্দিন। একটু থেমে বললেন—স্যার, একটা কথা আমি প্রথম থেকেই আপনাদের কাছে গোপন করে গেছি। এখন না বলে পারছি না স্যার।

মিঃ জাফরী এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসার একসঙ্গে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেললেন মিঃ গিয়াস উদ্দিনের মুখে।

মিঃ গিয়াস উদ্দিন ঢোক গিলে বললেন—স্যার, একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেছে কয়েকদিন পূর্বে।

বলুন কি সে আশ্চর্য ঘটনা?

স্যার, ক'দিন আগের কথা...আমি অফিসে বসে কাজ করছিলাম, হঠাৎ আমার দারোয়ান এসে জানালো, একজন ভদ্রলোক এসেছেন সাক্ষাৎ করতে চান। আমি বললাম, আসতে বলো। আমি মাথা নিচু করে টেবিলে কাজ করছিলাম। হঠাৎ আমার নাম উচ্চারণ করে ডাকলেন। আমি চোখ তুলে অবাক হয়ে গেলাম, আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে মিঃ আহসান সাহেব...

প্রায় একসঙ্গে বলে উঠেন পুলিশ কর্মকর্তাগণ—মিঃ আহসান!

হাঁ, তিনি একটা ওভারকোট গায়ে, চোখে গগলস্, আমার বসতে বলার অপেক্ষা না করেই বসে পড়লেন সম্মুখস্থ চেয়ারে।

সবার চোখে বিস্ময়, কারণ মিঃ আহসান প্রায় সপ্তাহ তিন হলো নিখোঁজ হয়েছেন। তিনি বেঁচে আছেন, না তার মৃত্যু ঘটেছে।, এটাও কেউ সঠিক জানেন না। সমস্ত পুলিশ মহলে মিঃ আহসানকে নিয়ে ভীষণ উদ্বিগ্নতা দেখা দিয়েছে—তাঁকে সন্ধান করে ফিরছে নানা স্থানে। তার বাসার আত্মীয়স্বজন শোকাতুর হয়ে পড়েছেন, এমন মুহূর্তে মিঃ আহসান সম্বন্ধে জানতে পেরে বিস্মিত হবার কথাই বটে।

বললেন মিঃ জাফরী—তারপর?

মিঃ গিয়াস উদ্দিন বলতে শুরু করলেন—মিঃ আহসান আমাকে বিস্মিতভাবে তাঁর দিকে তাকাতে দেখে বললেন, আমি মরিনি, বেঁচেইছিলাম

এবং আছি। মিঃ ফিরোজ রিজভীর সঙ্গেই আছি আমি, কারণ তাঁকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমিই গ্রহণ করেছি।

আমি তাঁর কথা শুনে বলে উঠলাম—আপনি রিজভী সাহেবের সঙ্গে ছিলেন?

ছিলাম নয়, আছি এবং সেই কারণেই আমাকে কেউ কান্দাই শহরে দেখতে পাচ্ছে না। যা হোক, আমি এসেছিলাম এ সংবাদ কাউকে জানাবেন না, কারণ এতে রিজভী ও তাঁর সঙ্গীদের অমঙ্গল ঘটতে পারে। কথাগুলো বলে আহসান সাহেব পকেট থেকে একখানা চেক বের করে আমার সম্মুখে মেলে ধরলেন। একটা কথা স্যার, আমাদের কোম্পানীর যে টাকা-পয়সা ব্যাঙ্কের সঙ্গে লেনদেন চলতো তা মিঃ রিজভী এবং আমার সই দ্বারাই হতো। চেকে রিজভীর সই দেখলাম। মিঃ আহসান আমাকে চেকে সই করার জন্য অনুরোধ করলেন। চেকে টাকার কোনো অঙ্ক লেখা না থাকায় আমি ইতস্তত করছিলাম। মিঃ আহসান হেসে বললেন—আপনি নিঃসঙ্কোচে সই দিতে পারেন, কারণ আমি আপনাদের হিতাকাঙ্ক্ষী। দেখুন স্যার, মিঃ আহসান আমার অতি পরিচিত এবং পরম বন্ধু স্থানীয়, কাজেই আমি কোনো দ্বিধা না করে সই দিলাম।

ভ্রুকুঞ্চিত করে বললেন মিঃ হেলালী—মিঃ আহসান তাহলে চেকে সই নিতেই এসেছিলেন?

হাঁ, তিনি চেকে সই নিয়েই আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেলেন।

মিঃ জাফরী বললেন—এতবড় একটা জরুরী সংবাদ আপনি চেপে গেছেন?

মিঃ আহসানের অনুরোধে এবং আমার পরম বন্ধু মিঃ রিজভী ও তাঁর সঙ্গীদের মঙ্গলার্থে আমি কথাটা চেপে গিয়েছিলাম স্যার।

মিঃ জাফরী একটা শব্দ উচ্চারণ করলেন—হু! তারপর বললেন—মিঃ আহসান তাহলে জীবিত আছেন এবং মিঃ রিজভী ও তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে ছিলেন। আশ্চর্য বটে...

মিঃ জায়েদী বললেন—একেবারে বিস্ময়কর ব্যাপার। মিঃ আহসান এভাবে আত্মগোপন করে রয়েছেন কেন বুঝতে পারছি না। মিঃ রিজভী ও তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গেই যদি থাকবেন তবে তিনি কি করছেন? আজ যে লাশগুলো এসেছে, এই হত্যা রহস্যের সঙ্গে মিঃ আহসান জড়িত আছেন কিনা। তবে কি মিঃ আহসান দস্যু বনহুরকে সহায়তা করে চলেছেন?

মিঃ জায়েদী কথগুলো বলে একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলেন।

মিঃ জাফরী বললেন—বিরাট একটা রহস্য আজ আমাদের সম্মুখে পাকিয়ে উঠেছে। নিশ্চয়ই এই রহস্যজালে জড়িয়ে পড়েছেন মিঃ আহসান।

মিঃ হেলালী বললেন—স্যার, যত কিছুর মূলে রয়েছে স্বয়ং দস্যু বনহুর তাতে কোনো সন্দেহ নাই। আমি কান্দাই আসার পর দস্যু বনহুর সম্বন্ধে যতটুকু জানতে পেরেছি তাতে আমার শুধু চক্ষুস্থিরই হয়নি, আমি এক অদ্ভুত রহস্যের অতলে তলিয়ে গেছি। স্যার, আমাকে আপনারা বিশ্বাস করুন, আমি এ হত্যা রহস্য উদঘাটন করবোই করবো।

ধন্যবাদ মিঃ হেলালী, আপনার এ যাত্রা যেন জয়যুক্ত হয়। বললেন মিঃ জায়েদী।

মিঃ জাফরী বললেন—আপনি এগুতে থাকেন, আমরা আছি আপনার সঙ্গে।

মিঃ হেলালী হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডসেক করলেন দু'জন পুলিশ প্রধানের সঙ্গে।

মিঃ গিয়াস উদ্দিন বললেন এবার—স্যার, আমি কোনো ভরসা পাচ্ছি না, না জানি কখন আমার ভাগ্যে কি ঘটবে কে জানে!

মিঃ গিয়াস উদ্দিনের মুখোভাব অত্যন্ত ভয়ার্ত ও বিবর্ণ হয়ে উঠেছিলো, তিনি অসহায় কণ্ঠে কথাগুলো বললেন।

মিঃ জাফরী বললেন—দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই মিঃ গিয়াস উদ্দিন। আজ থেকে আপনার জন্য পুলিশ গার্ড ব্যবস্থা করা হবে। তাছাড়া আপনার বাসা এবং আপনাদের দিরু ফার্মে পাহারার ব্যবস্থা করা হবে।

কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন মিঃ গিয়াস উদ্দিন—মিঃ জাফরী, এখন আপনারা আমার সহায়ক। আপনারা যদি আমাকে না রক্ষা করেন তাহলে দস্যু বনহুর আমাকে হত্যা না করে ছাড়বে না।

মিঃ জাফরীই বললেন আবার—মিঃ গিয়াস, আপনি বেশি উত্তেজিত হবেন না। দস্যু বনহুর আপনার কেশ স্পর্শ করতেও সক্ষম হবে না, আপনার জন্য আমরা সেই রকম ব্যবস্থা নেবো যে রকম ব্যবস্থা আমরা মিঃ ইয়াসিনের জন্য নিয়েছি।

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালেন মিঃ গিয়াস উদ্দিন মিঃ জাফরীর মুখের দিকে।

❑

সমস্ত শহরময় যখন মিঃ ফিরোজ রিজভী ও তার সঙ্গীদের হত্যাকাণ্ড নিয়ে একটা ভীষণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে তখন চৌধুরী বাড়িতে মরিয়ম বেগম মৃত্যুশয্যায় শায়িত। পুত্রের দেখা না পেয়ে তিনি দিন দিন বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

ডাক্তার বলেছেন, অচিরে তাঁকে তাঁর আকাঙ্ক্ষিত জনের সঙ্গে সাক্ষাৎলাভ ঘটানো প্রয়োজন, নাহলে তাঁকে কিছুতেই বাঁচানো সম্ভব হবে না।

মনিরা অবিরত চোখের পানি ফেলে চলেছে। সে শাশুড়ী আম্মাকে কি সান্ত্বনা দেবে ভেবে পায় না। তাঁর সন্তান এসেছিলো এ কথা বারবার বলেছে সে কিন্তু মরিযম বেগম তাতে কোনো সান্ত্বনা খুঁজে পাননি, তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছেন না তার মনির বেঁচে আছে এবং সুস্থ আছে।

কেন যে তিনি হঠাৎ সন্তানের জন্য এত উতলা হয়ে পড়েছেন একমাত্র আল্লাহই জানেন।

মনিরা যখন শুনতে পেলো তার স্বামী নতুন উদ্যমে আবার নরহত্যা শুরু করেছে তখন সে একেবারে মুষড়ে পড়লো। কথাটা কাউকে বলবে সে উপায় নেই। মামীমা ভয়ানক অসুস্থ, নাহলে তিনি শুধু বুঝতেন তার মনের কথা। নূর কিছু বোঝে না, তাকে এসব জানানোও যাবে না কোনোদিন। সরকার সাহেব জানেন, সব বোঝেন, তিনি মনিরার দিকে নীরবে তাকিয়ে থাকেন। দৃষ্টির মাধ্যমে চলে তাদের বাক্য বিনিময়।

সরকার সাহেব নীরবে সরে যান।

মনিরা নিজের ঘরে গিয়ে বালিশে মুখ গুঁজে রোদন করে।

নূর যখন বাইরে যায় তখন সরকার সাহেব পা টিপে টিপে প্রবেশ করেন মনিরার কক্ষে। তিনি তাকিয়ে দেখেন মনিরা বিছানায় শুয়ে বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদছে। সরকার সাহেব আলগোছে এসে বসেন মনিরার পাশে, মাথায় হাত রাখতেই মনিরা উচ্ছসিতভাবে কেঁদে উঠে—চাচাজান, আর কত সইবো বলুন? আর যে পারি না আমি......

বাষ্পরুদ্ধ গলায় বলেন সরকার সাহেব—কেঁদোনা মা, কেঁদোনা। একে বেগম সাহেবার এ অবস্থা, আর তুমি যদি এভাবে ভেঙ্গে পড়ো মা, তাহলে নূরের কি অবস্থা হবে ভেবে দেখেছো?

কিন্তু কি করবো সরকার চাচা, আজ মা মৃত্যুশয্যায়, আর তাঁরই পুত্র কিনা নরহত্যা করে বেড়াচ্ছে। একটুও কি মায়াদয়া কিচ্ছু নেই তার? এত হৃদয়হীন পশুর চেয়েও অধম সে...

ছিঃ মা, ও কথা বলোনা, মুনির বাবা অন্যায়ভাবে কোনো দিন নরহত্যা করেনা, করতে পারে না সে। নিশ্চয়ই যাদের হত্যা করা হয়েছে তারা পাপী...

সরকার চাচা, আপনি জানেন না যাদের হত্যা করা হয়েছে তাঁরা মহৎ ব্যক্তি ছিলেন। এমন কোনো কাজ করেননি তাঁরা যার জন্য তাঁদের হত্যা করা হলো?....

ও তুমি বুঝবে না মা, নিশ্চয়ই ভিতরে কোনো গভীর রহস্য আছে যা আমি তুমি বুঝবো না।

এমন সময় নূর আসে সেখানে—আম্মি শুনেছো দস্যু বনহুর আবার মানুষ খুন করেছে। একটি নয়, এক সঙ্গে পাঁচটি।

সরকার সাহেব কিংবা মনিরা কেউ কোনো কথা বলে না। শুধু উভয়ে একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নেয়।

নূর বলে উঠে আবার—সরকার দাদা, আপনি আম্মিকে বলেছেন বুঝি?

হাঁ দাদু, আমি আগেই তোমার আম্মিকে এ সংবাদটা জানিয়েছি।

আম্মি, কি ভয়ঙ্কর কথা! না জানি দস্যু বনহুর কখন কোন্ মুহূর্তে আমাদের বাড়ি এসে আমাদের সবাইকে হত্যা করে বসবে। দাদু সে জন্যই বুঝি সব সময় পুলিশ আমাদের বাড়ির আশেপাশে দাঁড়িয়ে থাকে?

হাঁ ভাই, দস্যু বনহুর যেন এ বাড়িতে আসতে না পারে, এ জন্যই পুলিশ এভাবে কড়া পাহারা দেয়। তোমার কোনো ভয় নেই, দস্যু বনহুর আমাদের কারো কোনো ক্ষতি করবে না। যাও ভাই, তুমি পড়াশোনা করোগে, যাও।

নূর লক্ষ্মী ছেলের মত বেরিয়ে যায়।

পাশের কক্ষ থেকে ঝি ফুলির মা ডাক দেয়—আপামনি, বেগম সাহেবা তোমাকে ডাকছেন।

সরকার সাহেব বলেন—যাও মা, বেগম সাহেবার কাছে যাও, তিনি তোমায় ডাকছেন। কিন্তু এসব কথা যেন বেগম সাহেবার কানে না যায়।

মনিরা আঁচলে চোখ মুছে উঠে দাঁড়ালো, বললো সে—সরকার চাচা, একবার ডাক্তার সাহেবের কাছে যেতে হবে, তিনি যেন বিকেলে আসেন।

আচ্ছা মা আচ্ছা, যাবো।

বেরিয়ে যান সরকার সাহেব।

মনিরা শাশুড়ীর ঘরে প্রবেশ করে।

ফুলির মা এতক্ষণ বসে বসে বেগম সাহেবার মাথায় বাতাস করছিলো এবার সে হাতপাখা রেখে উঠে দাঁড়ায়।

মনিরা এসে বলে—মামীমা, এখন কেমন বোধ করছো?

ভাল না মা, ভাল না। এ যাত্রা আর বুঝি বাঁচবো না মনিরা।

ছিঃ অমন কথা বলো না মামীমা, বুকটা আমার জ্বালা করে উঠে। বাপ-মা, মামা সবাই আমাকে ত্যাগ করে গেছে, তুমিও যদি যাও তবে কি নিয়ে বাঁচবো মামীমা? ফুপিয়ে কেঁদে উঠে মনিরা।

মরিয়ম বেগম তীর জীর্ণ হাত খানা তুলে দেন মনিরার মাথায়—কাঁদিস্ নে মা, কাঁদিস্ নে। এমনি করে আর কতদিন আমাকে তোরা ধরে রাখতে চাস্। আমি যে হাঁপিয়ে পড়েছি...

মামীমা, তুমি সুস্থ হয়ে উঠো, নাহলে তোমার সঙ্গে আমিও মরবো।

আবার ঐ কথা? ছিঃ মা ধৈর্য ধর্। নূরকে মানুষ করতে হবে, এ কথা ভুলে যাস্নে। মনিরা, তোর যে অনেক কাজ এখনও বাকি। একটু পানি দেতো মা, গলাটা শুকিয়ে গেছে।

পানি নয়, একটু দুধ খাও মামীমা। তুমি কিচ্ছু খেতে চাওনা, না খেলে চলবে কি করে বলো?

জীবনে অনেক খেয়েছি, আর নাই বা খেলাম। তুই আমাকে পানি দে মনিরা।

অগত্যা মনিরা পানির গেলাসটা বাড়িয়ে ধরে মরিয়ম বেগমের মুখে।

মরিয়ম বেগম এক নিঃশ্বাসে পানির কিছুটা পান করে গেলাস সহ মনিরার হাতখানা সরিয়ে দিয়ে বলে—মনিরা, সত্যি করে বল্ তো মা, মনির...আমার মনির এসেছিলো?

বিশ্বাস করো মামীমা, সে এসেছিলো কিন্তু বেশিক্ষণ থাকবার সময় সে পায়নি। সে যখন এসেছিলো তুমি তখন অজ্ঞান ছিলে...

নিষ্ঠুর আমাকে ঐ অবস্থায় ফেলে যেতে পারলো? একটুও মনে ব্যথা জাগলো না তার?

মামীমার কথায় কোনো জবাব দিতে পারলো না মনিরা। কারণ সেদিন সে এসেছিলো এবং কেন সে দ্রুত চলে গেছে, এসব কথা গোপন রাখতে হয়েছে মরিয়ম বেগমের কাছে। যদি তিনি জানতে পারতেন পুলিশ তাঁর সন্তানকে গ্রেপ্তার করতে এসেছিলো তাই সে পালাতে বাধ্য হয়েছে, তাহলে

মরিয়ম বেগম আরও মুষড়ে পড়তেন, হয়তো বা তিনি সহ্য করতে পারতেন না, তাই কথাটা গোপন করতে হয়েছিলো তাঁর কাছে।

মনিরার চোখ দুটো ছলছল করে উঠে। স্বামীর মুখখানা ভেসে উঠে চোখের সামনে, যে মুহূর্তে বনহুর বেরিয়ে গিয়েছিলো ঐ মুহূর্তে সে একবার মনিরার মুখে তাকিয়েছিলো—সেই দৃষ্টির কথা এতক্ষণে মনে পড়ে মনিরার। আজ মনিরা কি জবাব দেবে শাশুড়ীর কথায় ভেবে পায় না। কত ব্যথা নিয়ে সেদিন সে চলে গেছে আর কেউ না বুঝলেও বোঝে মনিরা।

❑

রহমান মায়ের অসুখ কেমন হলো, সংবাদ নিয়েছো?

হাঁ সর্দার, কাল গিয়েছিলাম, মায়ের অসুখ আরও বেড়েছে। ডাক্তার বলেছে রোগী মানসিক দুশ্চিন্তায় ভুগছে। যা তিনি চান তাই তাঁকে দিতে হবে, নাহলে তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হবে না। সর্দার, আপনি জানেন তিনি কি চান, কাকে চান......

জানি! জানি রহমান কিন্তু কি করবো বলো? তুমি আমাকে একটা উপায় বলে দাও?

সর্দার, আপনি যখন কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছেন না তখন আমি কি উপায় বলতে পারি বলুন?

জানি তোমরা আমাকে কোনো পথ বলে দিতে পারবে না। বনহুর পায়চারী করতে লাগলো।

রহমান মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো।

ঐ মুহূর্তে কায়েস প্রবেশ করলো সেখানে, কুর্ণিশ জানিয়ে বললো —সর্দার।

থমকে দাঁড়িয়ে চোখ তুলে তাকালো বনহুর—বলো?

সর্দার আম্মার অসুখ আজ খুব বেড়েছে।

বনহুর তাকালো রহমানের দিকে, চোখে তার প্রশ্নভরা দৃষ্টি।

রহমান বললো—সর্দার, আমি সেখানে কায়েসকে রেখে এসেছিলাম, কারণ বেগম সাহেবা কখন কেমন হন যেন সে সংবাদ নিয়ে আসে।

বনহুর বলে উঠে—কায়েস, তুমি কি রাতে চৌধুরী বাড়ি ছিলে?

হাঁ সর্দার। চাকর আবদুলের বড় ভাইয়ের বেশে আমি চৌধুরী বাড়িতে ছিলাম। শেষ রাত থেকে বেগম সাহেবার অসুখ ভয়ানক বেড়ে গেছে।

ডাক্তার দেখছেন?

হাঁ, সব সময় দু'জন ডাক্তার বেগম সাহেবার পাশে আছেন।

রাতে কোন্ ডাক্তার ছিলেন?

রাতে ডাক্তার হুসাইন ছিলেন এবং তিনি সকাল অবধি ছিলেন আমি দেখে এসেছি।

বনহুর এসে তার শয্যায় বসলো; তারপর একটু ভেবে বললো—আচ্ছা, তুমি যাও কায়েস, বিশ্রাম করোগে।

কায়েস চলে গেলো।

রহমানকে লক্ষ্য করে বললো বনহুর—তাজকে প্রস্তুত রেখো, সন্ধ্যার পর আমি কান্দাই রওয়না দেবো।

সর্দার, চৌধুরী বাড়িতে যাবেন?

দেখি কতদূর কি করতে পারি। মাকে যেমন করে হোক বাঁচাতেই হবে।

রহমান বেরিয়ে যায়।

বনহুর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে বিছানায়, তার মুখমন্ডলে ব্যথা-বেদনা আর দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটে উঠে।

নূরী একটা গেলাসে দুধ নিয়ে প্রবেশ করে সেখানে।

বনহুর পাশের টেবিলে দুধের গেলাস রেখে বলে—হুর, তুমি কাল রাতে কিছু খাওনি, ওঠো দেখি দুধটুকু খেয়ে নাও।

বনহুর বলে—খিদে নেই নূরী।

জানি কোনো সময় তোমার খিদে পাবে না। নাও, এবার দুধটুকু খাও দেখি। নূরী দুধের গেলাস তুলে ধরে বনহুরের মুখে।

বাধ্য হয়ে দুধটুকু খায় বনহুর, তারপর হাতের পিঠে মুখ মুছে বলে—নূরী, আজ মায়ের অসুখ বেশি হয়েছে।

ভাবাপন্ন কণ্ঠে বলে নূরী—রহমানের কাছে সব শুনেছি। হুর, জানি তোমার জন্য আজ মায়ের এ অসুখ, কিন্তু...

নূরী, মায়ের যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে আমি বাঁচবো না, আমি বাঁচবো না নূরী।

নূরী বনহুরের চুলে হাত বুলিয়ে বলে—হুর, তুমি অধৈর্য হচ্ছো কেন? মা নিশ্চয়ই সেরে উঠবেন। আমার মন বলছে, মা সেরে উঠবেন।

সত্যি তোমার মন বলছে আমার মা বাঁচবে? বলো, বলো, নূরী? বনহুর নূরীর হাত দু'খানা মুঠায় চেপে ধরে ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠলো।

বললো নূরী—হাঁ হাঁ হুর, তুমি দেখো আমার কথা সত্য হবে।

কিন্তু মার যে অসুখ বেশি হয়েছে নূরী? মা আমাকে অনেকদিন দেখেননি তাই তিনি আমাকে দেখবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছেন। নূরী আমি যাবো, মাকে দেখতে যাবো মনস্থ করেছি।

হুর, তুমি কি পাগল হয়েছো? চৌধুরী বাড়ির চারপাশে অস্ত্রের বেড়াজালে ঘিরে রেখেছে কান্দাই পুলিশ বাহিনী। ওরা তোমাকে জীবিত কিংবা মৃত গ্রেপ্তার করবে।

এ কথা আজ নতুন নয় নূরী। কান্দাই পুলিশ বাহিনী এ প্রচেষ্টা এক যুগ থেকে চালিয়ে যাচ্ছে।

তুমি যেওনা হুর।

নূরী, আমি না গেলে মা বাঁচবে না। মা যে আমাকে কাছে পেতে চায়।

কিন্তু হঠাৎ যদি তোমার কোনো অমঙ্গল হয়?

একটু হেসে বলে বনহুর—তোমার মুখে একথা শোভা পায় না নূরী। তাজকে প্রস্তুত করতে বলেছি, আজই আমি কান্দাই রওয়ানা দেবো।

হুর, তুমি চৌধুরী বাড়ি যাবে তাহলে?

না হলে উপায় কি বলো? তবে প্রথমে ডাঃ হুসাইনের কাছে যাবো, তিনি কি বলেন...যদি জানতে পারি মা একটু সুস্থ তাহলে আপাততঃ যাওয়া বন্ধ রাখবো।

সত্যি তুমি যাবে না তো?

না, যদি মার অসুখ সম্বন্ধে ভাল সংবাদ পাই।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সন্ধ্যার অন্ধকার জমাট বেঁধে এলো। বনহুর নূরীর কাছে বিদায় নিয়ে তাজের পিঠে চেপে বসলো।

ঘন্টা দু'য়ের মধ্যে তাজ পৌঁছে গেলো কান্দাই শহরে।

ডাক্তার হুসাইনের বাড়ির অদূরে এসে তাজের পিঠ থেকে নেমে দাঁড়ালো বনহুর।

জমাট অন্ধকারে আচ্ছন্ন চারদিক।

আকাশে মিট মিট করে কয়েকটা তারা জ্বলছে।

বনহুর তাকিয়ে দেখলো, ডাক্তার হুসাইনের বাড়ির দ্বিতলে একটি কক্ষে আলো জ্বলছে। বনহুর জানতো, ডাক্তার হুসাইন এই কক্ষেই রাতে ঘুমান। আরও জনোতো সে, ডাক্তার রাত ধরে ডাক্তারী বই নিয়ে পড়াশোনা করেন। কান্দাই শহরে তাঁর নামডাক অত্যন্ত ভাল ছিলো, রোগীর সংখ্যা ছিলো প্রচুর। নানা ধরনের রোগির সমাবেশ ঘটতো তাঁর কাছে, কাজেই তাঁকে পড়াশোনা করতে হতো বেশি।

বনহুর প্রাচীর বেয়ে উঠে এলো দেয়ালের পাশে। একটা বিরাট ঝিম্‌সা গাছ ছিলো দেয়ালের ধারে, ঐ ঝিম্‌সা গাছ বেয়ে উঠে চললো।

ঝিম্‌সা গাছ আমাদের দেশের পাইন গাছের মত লম্বা। এতে ফুল হয় কিন্তু ফল হয় না। ডাক্তার হুসাইন এই ঝিম্‌সা গাছটা সখ করে তাঁর শয়নকক্ষের ধারে লাগিয়েছিলেন। ঝিম্‌সা ফুলের গন্ধ অতি মধুর।

বনহুর ঝিম্‌সা গাছ বেয়ে উঠে এলো দ্বিতলে।

ডাক্তার হুসাইন সবেমাত্র সার্জারী বইখানা বন্ধ করে উঠতে যাবেন, ঠিক ঐ মুহূর্তে বনহুর জানালা দিয়ে মেঝেতে লাফিয়ে পড়ে।

সঙ্গে সঙ্গে মুখ তুলে তাকান ডাক্তার হুসাইন। জমকালো পোশাক পরা বনহুরকে দেখতে পেয়ে চমকে উঠেন তিনি, বলেন——কে? কে তুমি?

এগিয়ে আসে বনহুর এবং শান্ত মোলায়েম কণ্ঠে বলেন—আমি! আমি দস্যু বনহুর।

তুমি! কি চাও আমার কাছে?

মিছামিছি উত্তেজিত হচ্ছেন ডাক্তার। আমি আপনার কাছে কিছু নিতে আসিনি, এসেছি আমার মায়ের সম্বন্ধে জানতে। বসুন ডাক্তার সাহেব।

ডাক্তার হুসাইনের দু'চোখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে। এতদিন তিনি দস্যু বনহুরের সম্বন্ধে নানা কথাই শুনে এসেছেন। যদিও তিনি এখন চৌধুরী বাড়ির ডাক্তার কিন্তু দস্যু বনহুরকে স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্য তাঁর হয়নি কোনোদিন।

দস্যু বনহুরের মুখে পাগড়ীর আঁচল জড়ানো ছিলো না, তাই ডাক্তার হুসাইন অবাক হয়ে দেখেছেন। এত সুন্দর চেহারার লোক তিনি কোনোদিন দেখছেন কিনা স্মরণ নেই।

ডাক্তার হুসাইনকে তার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখে একটু হেসে বলে বনহুর—দেখুন আমি আপনার সন্তানের মত। যদিও আমি দস্যু কিন্তু আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন কোনো অমঙ্গল হবে না আমার দ্বারা আপনার। আমার মা অসুস্থ কিন্তু তাঁকে আমি দেখতে যেতে পারি না। তাই এসেছি তাঁর অসুস্থতা সম্বন্ধে সংবাদ নিতে। একটু থেমে বলে বনহুর—ডাক্তার, বলুন আমার মা কেমন আছেন? তাঁর অবস্থা এখন কেমন? বলুন ডাক্তার?

বনহুরের ব্যাকুল কণ্ঠে ডাক্তার হুসাইনের মন ব্যথায় জর্জরিত হলো, তিনি বললেন—এতদিন তোমাকে কল্পনার চোখে দেখেছিলাম। কল্পনায় চিন্তা করতাম তোমাকে, আজ তোমাকে স্বচক্ষে দেখলাম... অপূর্ব, অপূর্ব তুমি দস্যু বনহুর।

বনহুর ডাক্তার হুসাইনের হাত দু'খানা মুঠায় চেপে ধরে বলে—ডাক্তার, মায়ের কথা বলুন? আমার মা বাঁচবেন তো।

এতক্ষণে যেন ডাক্তার হুসাইনের সম্বিৎ ফিরে আসে, তিনি বলেন —হাঁ, তোমার মা অসুস্থ কিন্তু...

বলুন...বলুন ডাক্তার, থামলেন কেন বলুন?

তোমার মার অসুখ মানসিক দুশ্চিন্তা, এই দুশ্চিন্তা দূর না হলে তিনি আরোগ্য লাভ করবেন না।

দুশ্চিন্তা। অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করলো বনহুর, তারপর বললো —ডাক্তার, আপনি বলুন কি করে আমার মায়ের দুশ্চিন্তা দূর করবো? বলুন ডাক্তার?

এক দুর্ধর্ষ দস্যুকে তার মায়ের জন্য এমনভাবে বিচলিত হতে দেখে অভিভূত হয়ে গেলেন ডাক্তার হুসাইন। তিনি জানতেন, দস্যু ডাকুদের মন স্বাভাবিক মানুষের মত হয় না, এরা প্রায়ই হৃদয়হীন হয় কিন্তু ঠিক তার বিপরীত দস্যু বনহুর। ডাঃ হুসাইন অবাক হয়ে গেছেন। শুধু অবাক নয়— অভিভূত-বিস্মিত, বলেন তিনি—আমি জানি, তোমার মা শুধু তোমার জন্য আজ এমন অসুস্থ। এবার আমি তোমাকে ভরসা দিচ্ছি, তোমার মা আরোগ্য লাভ করবেন।

সত্যি? সত্যি ডাক্তার?

হাঁ,..কারণ তোমাকে আমি স্বচক্ষে দেখলাম। এতদিন আমি তাঁর শুধু চিকিৎসাই করে এসেছি তাঁকে কোনোরকম সান্তনা দিতে পারিনি। আমার চিকিৎসা করা কর্তব্য, তাই করে গেছি কিন্তু তাঁর আসল অসুখের ওষুধ দিতে পারিনি।

ডাক্তার, আমার মাকে আপনি আরোগ্য করুন। যা চাইবেন তাই দেবো। টাকা-পয়সা লোভ দেখিয়ে আপনাকে ছোট করতে চাইনা আমি....

আচ্ছা, তুমি আমার উপর বিশ্বাস রাখো, আমি যতটুকু পারবো তাঁকে আরোগ্য করে তোলার চেষ্টা করবো।

অনেক ধন্যবাদ ডাক্তার অনেক ধন্যবাদ। বনহুর যে পথে কক্ষে প্রবেশ করেছিলো সেই পথে বেরিয়ে যায়।

❑

মিঃ হেলালী নিজের শয়নকক্ষে সম্মুখস্থ বেলকুনিতে বসে সিগারেটের পর সিগারেট পান করে চলেছেন। তাঁর সম্মুখে সীমাহীন মুক্ত আকাশ। মিঃ হেলালীর দৃষ্টি ঐ জমকালো আকাশের দিকে। আজ আকাশে একটি তারাও নেই।

কেমন যেন একটা থমথমে ভাব সারা পৃথিবীটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

সন্ধ্যায় এক পশ্‌লা বৃষ্টিও হয়ে গেছে!

এখনও পাতায় পাতায় জমে আছে বৃষ্টির কণা। মাঝে মাঝে শোকাতুরা জননীর দীর্ঘশ্বাসের মত হাওয়া বইছে। টুপটাপ করে পড়ছে পাতা থেকে বৃষ্টির কণাগুলো ভিজে চপচপে মাটির উপর।

মিঃ হেলালী ভাবছেন গত পরশুর সেই প্যাকেট করা লাশগুলোর কথা। কিভাবে অন্যান্য মালপত্রের সঙ্গে সুন্দরভাবে লাশগুলোকে কাঠের বাক্সে প্যাকেট করে পাঠানো হয়েছে। বাক্স না খোলা পর্যন্ত কেউ বুঝতেই পারেনি তাতে কি আছে। একটি নয়, পাঁচ পাঁচটি লাশ—কান্দাই শহরের স্বনামধন্য ধনকুবের ফিরোজ রিজভী ও তার সঙ্গীদের মৃতদেহ। দস্যু বনহুর তাদের পিস্তলের গুলি বা ছোরা দ্বারা নিহত করেনি। হত্যা করেছে অগ্নিদগ্ধ পেরেক দ্বারা। অদ্ভুত এ হত্যালীলা। কিন্তু কেন দস্যু বনহুর তাদের অস্ত্রের দ্বারা হত্যা না করে এভাবে অদ্ভুত উপায়ে হত্যা করলো? নিশ্চয়ই এমন কোনো রহস্য আছে যা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারেনি বা পারবে না। দস্যু বনহুর সম্বন্ধে দীর্ঘ কয়েক বছরের রিপোর্ট পাঠ করে জানা যায়, যতগুলো হত্যা দস্যু বনহুরের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে, সবাই ধনকুবের, বিত্তশালী এবং বেশির ভাগ ব্যবসায়ী।

কান্দাই আসার পর থেকে হেলালী অবিরত পরিশ্রম করে চলেছেন। দস্যু বনহুর সম্বন্ধে তাঁর মনে নানারকম প্রশ্ন সদা-সর্বদা আলোড়ন সৃষ্টি করে চলেছে—দস্যু বনহুরকে কান্দাইবাসী কেমন চোখে দেখে...তাঁর সম্বন্ধে দেশবাসীর কি ধারণা...শুধু কি দস্যু বনহুরকে দেশবাসী ভয়ই করে, না তাকে ভালওবাসে।

দস্যু বনহুর সম্বন্ধ নানাজনের কাছে নানারকম কথা শুনেছেন। মিঃ জাফরীর নিকটে দস্যু বনহুর সম্বন্ধে যদিও সবকিছু মিঃ হেলালী অবগত হয়েছিলেন তবু তিনি গোপনে জনসাধারণের মধ্যে মিশে দস্যু বনহুর সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে শুরু করলেন। দেশের জনগণের মধ্যে দস্যু বনহুর ভয়ঙ্কর এক দস্যু হলেও সবাই তাকে মনে মনে ভালবাসে, এটাও তিনি উপলব্ধি করলেন। বিশেষ করে দস্যু বনহুর ধনবান সমাজের আতঙ্ক এং চিরদুঃখী অসহায় যারা, তাদের বন্ধুজন বলেই তিনি প্রমাণ পেলেন।

মিঃ হেলালী ভাবছেন অদ্ভুত এ দস্যু বনহুর, যার কার্যকলাপ সব কিছুই অদ্ভুত। শুধু সে নর হত্যাকারীই নয়, শত শত মরণমুখী মানুষের জীবনরক্ষকও হঠাৎ কক্ষমধ্যে টেলিফোনটা বেজে উঠে, মিঃ হেলালীর চিন্তাধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

অর্ধদগ্ধ সিগারেটটা এ্যাসট্রের মধ্যে গুঁজে রেখে উঠে গেলেন এবং রিসিভার তুলে নিলেন হাতে।

সঙ্গে সঙ্গে ওপাশ থেকে ভেসে এলো মিঃ ইয়াসিনের কম্পিত কণ্ঠ......হ্যালো, আমি ইন্সপেক্টার ইয়াসিন বলছি......আমার কক্ষের দেয়ালে একটা খট্ খট্ শব্দ হচ্ছে......কক্ষে আমি একা......আমার কেমন ভয় করছে...

মিঃ হেলালীর মুখ মুহূর্তে কঠিন হয়ে উঠলো, তিনি ব্যস্ত গলায় বললেন—মিঃ ইয়াসিন, আপনার কক্ষের দেয়ালে খট্ খট্ শব্দ হচ্ছে.... কেন পাহারাদারগণ...পাহারারত নেই কি...আপনি শিগ্গির তাদের সজাগ হবার জন্য জানিয়ে দিন...

মিঃ ইয়াসিনের গলা শোনা গেলো...পাহারারত পুলিশদের কোনো সাড়া শব্দ পাচ্ছি না...হ্যালো আমি...আমি...আ...মি...কে...কে... তুমি...

চমকে উঠলেন মিঃ হেলালী, মিঃ ইয়াসিনের গলা যেন আচম্বিতে থেমে গেলো। রিসিভার রাখার শব্দ হলো।

মিঃ হেলালী বুঝতে পারলেন নিশ্চয়ই মিঃ ইয়াসিনের কক্ষে এমন কেউ প্রবেশ করেছে যাকে দেখাবামাত্র তার কণ্ঠস্বর কেঁপে গেলো এবং ভয়-বিহ্বল কণ্ঠে তিনি উচ্চারণ করলেন, কে...কে...তুমি...দস্যু বনহুর নয় তো? নিজের মনকেই প্রশ্ন করেন মিঃ হেলালী, সঙ্গে সঙ্গে রিসিভার তুলে নিয়ে ডায়েল করেন মিঃ জাফরীর কাছে।

মিঃ জাফরী সুখ নিদ্রায় বিভোর ছিলেন, যদিও তাঁর সুখনিদ্রার সময়কাল এখন নয় তবু সমস্ত দিনের ক্লান্তি আর অবসাদে দু'চোখে নেমে এসেছিলো ঘুমের আমেজ।

টেবিলে ফোন বেজে উঠার সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠেন মিঃ জাফরী, বিছানা তেকেই হাত বাড়িয়ে তিনি রিসিভার তুলে নেন হাতে, তারপর বলেন—হ্যালো...

অমনি ওপাশে থেকে ভেসে আসে মিঃ হেলালীর ব্যস্ত কণ্ঠস্বর, আমি হেলালী বলছি...হ্যালো মিঃ জাফরী, মিঃ ইয়াসিন এই মুহূর্তে আমার কাছে ফোন করেছিলেন কে তার কক্ষে প্রবেশ করেছে... জানিনা কে সে লোক...যার আগমনে মিঃ ইয়াসিনের কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠেছিলো...ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম স্যার...

মিঃ জাফরীর চোখ থেকে ঘুম ছুটে গেলো, মুহূর্তে তিনি বিছানা থেকে তড়িৎগতিতে নেমে দাঁড়ালেন মেঝেতে। তারপর রিসিভার ভালভাবে এঁটে ধরে বললেন...এই মুহূর্তে মিঃ ইয়াসিন আপনাকে ফোন করেছিলেন...

...হাঁ স্যার, এই মুহূর্ত আমি তাঁর ফোন পেয়েছি......হঠাৎ লাইন কেটে গেলো...স্যার......নিশ্চয়ই মিঃ ইয়াসিন বিপদগ্রস্ত হয়েছেন...

মিঃ জাফরী বলে উঠেন...তাহলে এক মুহূর্ত আর বিলম্ব করা উচিত নয়...আপনি প্রস্তুত থাকুন, এক্ষুণি আমি মিঃ ইয়াসিনের ওখানে যাবার জন্য রওয়ানা দিচ্ছি...আপনাকে উঠিয়ে নিয়ে যাবো....

...আচ্ছা আপনি আসুন...

মিঃ হেলালী রিসিভার রেখে আলনা থেকে ওভারকোটটা টেনে নিয়ে গায়ে পরে নেন, তারপর টেবিলের ড্রয়ার খুলে বের করে নেয় রিভলভারখানা। পুনরায় রিসিভার হাতে তুলে নিয়ে ডায়াল করেন, এবার মিঃ জাফরী বা অন্য কোন পুলিশ অফিসারের কাছে নয়, একেবারে মিঃ ইয়াসিনের কাছে। ...হ্যালো...হ্যালো...ও পাশে রিং হবার শব্দ ভেসে আসেছে কিন্তু কোনো সাড়াশব্দ নেই। মিঃ ইয়াসিন কি করছেন তার কোনো জবাব পাওয়া যাচ্ছে না কেন। ফোন কেউ ধরছে না ব্যাপার কি।

এমন সময় নিচে গাড়ি থামার শব্দ হলো।

মিঃ হেলালী বুঝতে পারলেন মিঃ জাফরী এসেছেন, তিনি বিলম্ব না করে সিড়ি বেয়ে নেমে এলেন তর তর করে।

মিঃ জাফরী এবং দুজন পুলিশ গাড়িতে রয়েছে।

মিঃ হেলালী গাড়ির পাশে এসে দাঁড়াতেই পুলিশদ্বয় নেমে দাঁড়ালো।

মিঃ হেলালী চেপে বসতেই পুলিশদ্বয় উঠে বসলো—গাড়ি ছুটলো উর্দ্ধশ্বাসে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই মিঃ জাফরী সহ মিঃ হেলাল পৌছে গেলেন মিঃ ইয়াসিনের বাড়ির গেটে।

গেটে পৌছতেই গেটের পাহারাদার সেলুট জানিয়ে গেট খুলে দিলো।

মিঃ জাফরী বললেন—এরা দেখছি ঠিকমতই পাহারা দিচ্ছে। মিঃ জাফরী এবার গেটে পাহারারত পাহারাদারকে বললেন—বাড়ির আশেপাশে এবং পিছন অংশে যে সব পুলিশ পাহারা দিচ্ছিলো তারা কি সব ঠিক ঠিক জায়গায় পাহারারত আছে?

হ্যাঁর স্যার, আছে।

এগিয়ে এলেন মিঃ হারুন, তিনিই আজ রাতে ইনচার্জ ছিলেন মিঃ ইয়াসিনের বাড়ির জন্য। তিনি এসে সেলুট করে বললো—সবাই ঠিকমত কাজ করছে স্যার।

মিঃ জাফরী বললেন—এইমাত্র আমরা মিঃ ইয়াসিনের ফোন পেয়েছি, কক্ষে কেউ প্রবেশ করেছিলো বলে মনে হলো....

সঙ্গে সঙ্গে বিবর্ণ হয়ে উঠে মিঃ হারুনের মুখমন্ডল, যদিও অন্ধকারে তাঁর মুখ বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো না, তবু বোঝা যায় তিনি এ সংবাদ শোনামাত্র কেমন যেন হয়ে গেলেন। কারণ তাঁরা তো সব সময় সজাগভাবে পাহারা দিয়ে যাচ্ছেন। বললেন মিঃ হারুন—স্যার কি বলছেন?

হাঁ মিঃ হারুন, আমরা মিঃ ইয়াসিনের ফোন পেয়েই ছুটে আসছি। জানি না কি ঘটেছে। কথাগুলো বলে মিঃ হেলালী বললেন—চলুন স্যার, দেখা যাক্ মিঃ ইয়াসিন কেমন আছেন?

মিঃ জাফরী ড্রাইভারকে গাড়ি ভিতরে নেবার জন্য নির্দেশ দিলেন।

গাড়ি-বারান্দায় গাড়ি পৌঁছতেই দু'জন প্রহরারত পুলিশ সেলুট করলো।

মি হেলালী এবং মিঃ জাফরী নেমে দাঁড়ালেন।

মিঃ জাফরী বললেন—মিঃ হেলালী, আপনি উপরে যান, আমি বাড়িটার পিছন অংশ পরীক্ষা করে আসছি—কারণ, আমাদের আগমনে কেউ নে পিছন দিক দিয়ে সরে না পড়তে পারে।

মিঃ হেলালী অগ্রসর হতেই তার সংগে দু'জন পুলিশও চললো।

সিঁড়ি বেয়ে কিছুটা এগুতেই সিঁড়ির মুখে একজন পাহারারত পুলিশ সেলুট করলো মিঃ হেলালীকে।

মিঃ হেলালী মাথা দোলালেন, তারপর পুলিশটির পাশ কেটে চলে গেলেন সিড়ি বেয়ে উপরে।

কিছুটা এগুতেই মিঃ ইয়াসিনের কক্ষে কেমন একটা ছট্‌ফটের শব্দ কানে এলো।

ওদিকে তখন পুলিশটি সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলো নিচে। গাড়ি বারান্দায় মিঃ জাফরীর গাড়িতে ড্রাইভার বসেছিলো।

পাহারারত পুলিশটি গাড়ির পাশে এসে গাড়ির দরজা খুলে উঠে বসে বললো—শিগ্‌গির পুলিশ অফিসে চলো। বিশেষ প্রয়োজনে পুলিশ সুপার আমাকে অফিসে যেতে বললেন। এখনি কাজ করে ফিরে আসবো।

ড্রাইভার মুহূর্ত বিলম্ব না করে গাড়ি ছাড়লো।

গেটের পাহারাদার দু'জন গেট খুলে সরে দাঁড়ালো।

গাড়ি বেরিয়ে গেলো উল্‌কা বেগে।

মিঃ জাফরী তখন পিছন অংশ থেকে সম্মুখে এগিয়ে আসছিলেন, হঠাৎ গাড়ি বেরিয়ে গেলো কেন বুঝতে না পেরে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সঙ্গী পুলিশদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করলেন।

পুলিশদ্বয় কোনো জবাব দিতে পারলো না।

মিঃ জাফরী এবং পুলিশদ্বয় গাড়ি বারান্দায় এসে দেখলেন তাঁদেরই গাড়ি বেরিয়ে গেছে। কে গাড়িতে গেলো আর কেনই বা গেলো মিঃ জাফরী বুঝতে পারলেন না। তিনি মনে করলেন, মিঃ হেলালী এ ব্যাপার নিশ্চয়ই জানেন। হয়তো তিনিই পাঠিয়েছেন কাউকে কোনো কারণে।

সিড়ি বেড়ে উঠে গেলেন উপরে কিন্তু সিঁড়ির মুখে না যেতেই এক জন পুলিশ দ্রুত ছুটে আসছিলো। সে মিঃ জাফরীকে সম্মুখে দেখতে পেয়ে ব্যস্তকণ্ঠে বললো—স্যার খুন...মিঃ ইয়াসিন খুন হয়েছে...

মিঃ জাফরী ক্ষণিকের জন্য হতবাক হয়ে পড়লেন। মিঃ ইয়াসিনকে দস্যু নহুরের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য পুলিশ মহল নানাভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে চলেছিলো। সব তাহলে ব্যর্থ হলো? মিঃ জাফরী কোনো কথা না বলে দ্রুত এগুলেন মিঃ ইয়াসিনের কামরার দিকে।

মিঃ ইয়াসিনের কামরায় প্রবেশ করে দেখলেন মিঃ ইয়াসিন মেঝের কার্পেটে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। তার বুকে একটি সূতীক্ষ্ণ ধার ছোরা গাঁথা। ছোরার সমস্ত অংশই প্রবেশ করেছে মিঃ ইয়াসিনের বুকের মধ্যে শুধু ছোরার বাটখানা উঁচু হয়ে আছে।

তাজা রক্তে ভিজে উঠেছে কার্পেটের কিছু অংশ। এখনও তাজা রক্ত ফিনকী দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে মিঃ ইয়াসিনের বুক থেকে।

মিঃ জাফরী যেন মুহূর্তের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন, তিনি নির্বাক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলেন—মিঃ ইয়াছিনের মৃত দেহের দিকে।

মিঃ ইয়াছিনের প্রাণ-বায়ু হয়তো কয়েক মিনিট পূর্বে বেরিয়ে গেছে। তার চোখ দুটো অর্দ্ধমেলিত অবস্থায় রয়েছে। মুখখানা বিকৃত রক্তশূন্য।

কক্ষ মধ্যে সবাই নীরব।

সামান্য কয়েক মিনিটের মধ্যেই এমন দুর্ঘটনা ঘটে গেলো। দস্যু বনহুরের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য মিঃ ইয়াসিন কিছুদিন হলো এই বাড়িতে বসবাস করছিলেন। সদাসর্বদা প্রহরা অবস্থায় তাঁকে থাকতে হবে এসব কারণেই তিনি নিজ বাড়ি ত্যাগ করে এ বাড়িতে এসেছিলেন। এ বাড়িতে সাধারণ লোকজনের আনাগোনা নিষেধ ছিলো। বাড়ি থানার পুলিশ বাহিনী দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা ছিলো। এতো সত্ত্বেও মিঃ ইয়াসিন দস্যু বনহুরের কবল থেকে বাঁচতে পারলেন না।

মিঃ হেলালী হাটু গেড়ে বসে ভালভাবে দেখছিলেন, এবার তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—আমাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে দস্যু বনহুর তার শপথ রক্ষা করেছে...

মিঃ জাফরীর যেন সম্বিত ফিরে এলো, তিনি বললেন—হাঁ মিঃ হেলালী আমাদের সব চেষ্টাই এই দুর্ধর্ষ দস্যু বার বার নস্যাৎ করে দিয়েছে। দস্যু বনহুর মিঃ ইয়াসিনকে হত্যা করে তবেই ছাড়লো।

মিঃ হেলালী বললেন—দস্যু বনহুর নিশ্চয়ই এই বাড়ির কোন অংশে আত্মগোপন করে আছে স্যার। কারণ মিঃ ইয়াসিনকে বেশিক্ষণ হলো খুন করা হয়নি।

মিঃ জাফরী বলে উঠলেন—মিঃ হেলালী আপনি দস্যু বনহুরকে ভালভাবে জানার সুযোগ এখনও পাননি—তাই এ কথা বলছেন। দস্যু বনহুর আমার গাড়ি নিয়ে এই মুহূর্তে চলে গেলো...

বিস্ময় ভরা কণ্ঠে বলে উঠলো মিঃ হেলালী—দস্যু বনহুর আপনার গাড়ি নিয়ে এই মুহূর্তে চলে গেলো বলেন কি-স্যার?

হাঁ মিঃ হেলালী?

আশ্চর্য!

শুধু আশ্চর্য নয় মিঃ হেলালী, শুধু আশ্চর্য নয় চরম বিস্ময়। এতো বড় দুর্ধর্ষ শয়তান—দস্যু বনহুর যেন আমাদের এতোগুলোর চোখে ফাঁকি দিয়ে পলিয়ে যেতে সক্ষম হলো একেবারে কল্পনাতীত।

স্যার দস্যু বনহুর শুধু দুর্ধর্ষ নয় তার মত সুচতুর বুদ্ধিমান বুঝি আর দ্বিতীয় হন নাই। তার শপথ রক্ষা করে সে সবার চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গেলো অথচ আমরা সেখানেই উপস্থিত ছিলাম।

মিঃ জাফরী সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ অফিসে এবং অন্যান্য পুলিশ ফাঁড়িতে ফোন করলেন, দস্যু বনহুর মিঃ ইয়াছিনকে হত্যা করে পুলিশ সুপারের গাড়ি নিয়ে পালিয়েছে।

সমস্ত শহর তখন ঘুমে অচেতন।

মিঃ জাফরীর গাড়ি খানা উল্‌কা বেগে কান্দাই হেড পুলিশ অফিস অভিমুখে ছুটে চলেছে।

জনশূন্য রাজপথ।

এক একটা জাগ্রত প্রহরীর মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে লাইট পোষ্টগুলো।

গাড়িখানা যখন লাইট পোষ্টের নিচ দিয়ে যাচ্ছিলো তখন লাইট পোষ্টের আলো এসে পড়ছিলো বনহুরের মুখে! পুলিশের ড্রেসে তাকে মানিয়েছে ভাল। দৃষ্টি তার গাড়ির সম্মুখে, কোন একটি মুহূর্তের জন্য প্রতিক্ষা করছে সে।

গাড়িখানা গ্রীন হাউসের নিকটর্তী হতেই বনহুর পকেট থেকে দ্রুত রিভলভার বের করে চেপে ধরলো ড্রাইভারের পিঠে—গাড়ি রোখো।

চমকে উঠলো ড্রাইভার, সে এক মনে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলো— তার গন্তব্য স্থান পুলিশ হেড অফিস কিন্তু হঠাৎ গাড়ি রাখার নির্দেশ এলো পিছন থেকে সঙ্গে সঙ্গে পিঠে শক্ত এবং ঠান্ডা কোন একটি বস্তুর অস্তিত্ব অনুভব করলো ড্রাইভার।

ব্রেক কষে ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে ফেললো।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালো, তারপর ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে বললো—তুমি যেখান থেকে এসেছো সেখানে ফিরে যাও।

গিয়ে বলো—দস্যু বনহুর গ্রীন হাউসে অপেক্ষা করছে।

দু'চোখ ছানা বড়া করে ঢোক গিললো ড্রাইভার—দস্যু বনহুরকে এতোক্ষণ ড্রাইভ করে নিয়ে এলো। কি ভয়ঙ্কর এবং আশ্চর্য কথা। ড্রাইভার হতভম্ব হয়ে পড়েছে।

বনহুর দ্রুত গ্রীন হাউসের দিকে চলে গেলো।

ড্রাইভার অগত্যা গাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে চললো—যেখান থেকে এসেছিলো সেখানে।

মিঃ জাফরী এবং হেলালী তখন মিঃ ইয়াসিনের লাশ পরীক্ষা করে দেখছিলেন।

ছোরাখানা টেনে তুলে নিলেন মিঃ জাফরী।

ঠিক্ ঐ মুহূর্তে একজন পুলিশ ব্যস্তভাবে এসে বললেন—স্যার আপনার গাড়ি ফিরে এসেছে।

গাড়ি ফিরে এসেছে! কথাটা উচ্চারণ করলেন মিঃ জাফরী।

মিঃ হেলালীও বিস্ময় নিয়ে তাকালো পুলিশটার মুখে।

মিঃ জাফরী বললেন—ড্রাইভার একা ফিরে এসেছে?

হাঁ স্যার।

তাকে পাঠিয়ে দাও।

ঐ দণ্ডে আর একজন পুলিশ এসে জানালো—স্যার সিড়ির নিচে আমাদের একজন পাহারাত পুলিশ প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় হাত পা মুখ বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। চলুন স্যার দেখবেন চলুন।

মিঃ জাফরী দাঁতে দাঁত পিষে বললেন—শয়তানটা দেখুন কিভাবে চাতুরী খেলেছে। পাহারারত পুলিশকে বন্দী করে তার ড্রেস নিয়ে আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে আমারই গাড়ি নিয়ে পালালো অথচ আমরা সবাই......

কথা শেষ না করেই থেমে গেলেন মিঃ জাফরী।

মিঃ হেলালী বললেন—স্যার আমরা সবাই বেঁকুফ বনে গেলাম।

এক সময় একজন পুলিশ হঠাৎ বলে উঠলো—হুজুর মিঃ ইয়াসিন সাহেবের হাতের মুঠায় কিছু আছে বলে মনে হচ্ছে।

মিঃ জাফরী এবং মিঃ হেলালীর দৃষ্টি গিয়ে পড়লো নিহত মিঃ ইয়াসিনের হাতের মুঠায়। মনে হলো তার হাতের মধ্যে এক টুকরা কাগজ রয়েছে।

মিঃ হেলালী কাগজের টুকরাখানা বের করে নিলেন মিঃ ইয়াসিনের হাতের মুঠো থেকে। মেলে ধরনের তিনি তারপর পড়লেন—

বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলাম তাই
তার প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করলাম।

ইয়াসিন হক

মিঃ জাফরী কাগজের টুকরাখানার উপর ঝুকে দেখে নিয়ে বললেন—এটা দেখছি মিঃ ইয়াসিনেরই হাতের লেখা।

মিঃ হেলালী বললেন—স্যার দস্যু বনহুর তাঁকে হত্যা করবার পূর্বে তারই দ্বারা এ কাগজখানা তাঁকে লিখতে বাধ্য করেছিলো।

হাঁ তাই তো দেখছি, মিঃ ইয়াছিন দ্বারা এই চিরকুটখানা লিখে নেওয়ার পর তাকে হত্যা করা হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নাই। কথাগুলো বলে মিঃ জাফরী পুনরায় চিরকুটখানা হাতে নিয়ে পড়তে লাগলেন।

ততক্ষণে মিঃ জাফরীর গাড়ির ড্রাইভারসহ পুলিশটি উপরে উঠে এলো। ড্রাইভারের চোখে মুখে ভীত আতঙ্কভরা ভাব। সেলুট করলো সে মিঃ জাফরী ও মিঃ হেলালীকে।

মিঃ জাফরী কঠিন কণ্ঠে বললেন—কোথায় গিয়েছিলে?

স্যার আমি কিচ্ছু জানিনা। আমি কিচ্ছু জানি না স্যার দস্যু বনহুর আমাকে.......

বলো থামলে কেনো?

স্যার ঐ পুলিশটা যে দস্যু বনহুর তা আমি বুঝতে পারিনি স্যার। আমাকে বললো—এক্ষুণি পুলিশ অফিসে যেত হবে চলো।

তুমি তাই নিয়ে গেলে না।

হাঁ স্যার।

আমি কি তোমায় সে রকম কিছু নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলাম?

না স্যার।

তবে গেলে কেনো জবাব দাও?

তখন এতো কিছু ভাবতে পারিনি। আমাকে মাফ্ করে দিন স্যার। আমি ভেবেছিলাম হয়তো আপনি বা মিঃ হেলালী তাকে পুলিশ অফিসে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন তাই......

তাই তুমি আমার বিনা অনুমতিতে যা খুশি তাই করবে।

হুজুর।

দস্যু বনহুরকে কোথায় রেখে এলে?

হুজুর গ্রীন হাউসে সে নেমে গেছে।

মিঃ হেলালী বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন—গ্রীন হাউসে?

হঁ স্যার।

মিঃ হেলালী এবং মিঃ জাফরী উভয়ে তাকালেন উভয়ের মুখে। বললেন মিঃ জাফরী—গ্রীন হাউসে তাকে নামিয়ে দিয়ে তুমি ফিরে এলে?

হাঁ দস্যু বনহুর নিজে বললেন—তুমি যেখান থেকে এসেছো সেখানে ফিরে যাও। গিয়ে বললো দস্যু বনহুর গ্রীন হাউসে অপেক্ষা করছে...

মিঃ জাফরী বললেন—স্পর্দ্ধ দেখুন।

মিঃ হেলালী বললেন—স্যার স্পর্দ্ধা নয় তার দুর্ধর্ষ মনের পরিচয় এটা। যাক্ এবার কি করা যায় বলুন? যা ঘটে গেছে তার আর কোন উপায় নেই। মিঃ ইয়াসিনকে আর বাঁচানো গেলো না। এবার লাশ মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করে ফিরে চলুন।

ড্রাইভার বলে উঠে—স্যার দস্যু বনহুর গ্রীন হাউসে অপেক্ষা করছে আপনারা যদি তাড়াতাড়ি করেন তাহলে...

অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন মিঃ হেলালী—দস্যু বনহুর গ্রীন হাউসে অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য বলো কি ড্রাইভার?

হ্যাঁ স্যার।

দস্যু বনহুর নির্বোধ নয় যে সে আমাদের জন্য গ্রীন হাউসে অপেক্ষা করবে।

মিঃ ইয়াসিনের মৃত দেহ মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করে ফিরে চললেন—জাদরেল পুলিশদ্বয়। এতো সাবধানতা সত্ত্বেও এ দুর্ঘটনা ঘটে গেলো। কেউ পারলো না মিঃ ইয়াসিনকে দস্যু বনহুরের হাত থেকে রক্ষা করতে।

পরদিন সমস্ত শহরে ঘটনাটা ছড়িয়ে পড়লো।

এক সপ্তাহ পূর্বে মিঃ ফিরোজ রিজভী ও তার সহকারীগণের হত্যাকান্ড কান্দাইবাসীকে ভীত আতঙ্কিত করে তুলেছিলো। পুনরায় মিঃ ইয়াসিনের বিস্ময়কর হত্যা মানুষকে ভীষণভাবে ভাবিয়ে তুললো।

মিঃ জাফরী গম্ভীর হয়ে পড়লেন। দস্যু বনহুরের কাছে পুলিশ মহলের কাছে বার বার চরম পরাজয় শুধু লজ্জাকর নয় বিরাট ব্যর্থতার পরিচয়।

মিঃ হেলালী সেই দিনই দস্যু বনহুর গ্রেপ্তার সম্বন্ধে গোয়েন্দা বিভাগ নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে ফেললেন। এই কমিটির কাজ হলো শুধু দস্যু বনহুর গ্রেপ্তার নিয়ে সূক্ষ্ম গবেষণা চালানো।

মিঃ হেলালী কয়েকজন দক্ষ পুলিশ অফিসার ও গোয়েন্দা বিভাগীয় অফিসারদের নিয়ে কান্দাই জেলা প্রশাসকের অফিসে বসে আলোচনা করলেন। আলোচনার মূল বিষয় বস্তু হলো পুলিশ মহলের এতো সাবধানতা এবং সতর্কতা সত্ত্বেও দস্যু বনহুর তার কাজ নীরবে চালিয়ে চলেছে। কি করে আর কেমন ভাবে এই দস্যুকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হবে এই নিয়েই তর্ক বির্তক শলা পরামর্শ চললো।

আলোচনা শেষ হতে প্রায় রাত অনেক হয়েছিলো। মিঃ হেলালী যখন বাংলোয় ফিরলেন তখন রাত দু'টো বেজে গেছে।

বাংলোয় মিঃ হেলালী বয় বাবুর্চি দারওয়ান এবং গুটি কয়েক প্রহরারত পুলিশ ছাড়া অন্য আর কেউ নেই। তিনি এখনও অবিবাহিত। কাজেই অন্য কোন ঝামেলা নাই।

মিঃ হেলালী এ জন্যই সচ্ছন্দে দস্যু বনহুর গ্রেপ্তার অভিযান চালানো ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করতে পেরেছেন। দেশে বাবা মা এবং ছোট ছোট ভাই-বোন আছে। তারা মিঃ হেলালীর উপার্জনেরই মুখাপেক্ষী।

মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে মিঃ হেলালী। পিতা এখন উপার্জনে অক্ষম বৃদ্ধ কাজেই মিঃ হেলালীকেই তার সব কিছু খরচ পত্র বহন করতে হয়, এসব কারণেই মিঃ হেলালী আজও বিয়ে করেন নাই।

পিতা-মাতা ভাই-বোন সবাই দেশে কাজেই বনহুর গ্রেপ্তার ব্যাপারে মিঃ হেলালীকে বাধা দেবার কেউ ছিলো না। তবে মিঃ হেলালী স্বার্থহীন অন্যায় বিরোধী মানুষ। যদিও পুলিশের চাকরিতে তার খুব একটা ইচ্ছা ছিলো না তবু তিনি কতকটা বাধ্য হয়েই এ চাকরি গ্রহণ করেছিলেন পিতা-মাতা ভাই-বোনদের মুখের দিকে তাকিয়ে।

আজ মিঃ হেলালী দস্যু বনহুর গ্রেপ্তার অভিযান শুরু করলেও তিনি লক্ষ টাকা পুরস্কারের লোভে নয় নেশা এবং জেদের বশবর্তী হয়ে, এ অভিযানে আত্ম নিয়োগ করেছেন।

মিঃ হেলালীর গাড়ি বাংলোর অভ্যন্তরে প্রবেশ করলো।

বাংলোর সম্মুখে গাড়ি থামতেই ড্রাইভার নেমে গাড়ির দরজা খুলে ধরলো।

মিঃ হেলালী নেমে গাড়ি থেকে বাংলোর ভিতরে চলে গেলেন।

রাত দুটো।

কাজেই মিঃ হেলালী তাড়াতাড়ি তাঁর শয়ন কক্ষে প্রবেশ করে জামা কাপড় পাল্টে নিয়ে বাথরুমে প্রবেশ করলেন।

বাথরুম থেকে বেরুতেই বয় একটা চিঠি টেবিলে রেখে বললো —স্যার ড্রাইভার চলে যাবার সময় এটা আপনাকে দিতে বলে গেলেন।

মিঃ হেলালী তোয়ালে দিয়ে হাতমুখ পরিস্কার করে মুছে নিয়ে বিছানায় বসলেন তারপর টেবিলে ঢাকা দেওয়া ঠান্ডা পানি এক নিঃশ্বাসে পান করে নিয়ে লঘু হস্তে চিঠিখানা তুলে নিলেন হাতে। ভাবলেন নিশ্চয়ই ড্রাইভার কাল ছুটি চাইবে এটা তারই চিঠি।

জেলা প্রশাসকের অফিসেই ডিনার শেষ করে এসেছেন মিঃ হেলালী কাজেই খাওয়া দাওয়ার হাঙ্গামা ছিলোনা। যদিও খাবার টেবিলে ঢাকা দেওয়াই ছিলো। মিঃ হেলালী চিঠিখানা ধীরে সুস্থে খাম থেকে বের করে মেলে ধরতেই চমকে সোজা হয়ে বসলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট কণ্ঠে শুরু করলেন—"বন্ধুবর মিঃ হেলালী, দস্যু বনহুর গ্রেপ্তারে অভিযান যেভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন সেই ভাবে যদি

দুষ্কৃতিকারী নিধন অভিযান চালিয়ে
যাবার জন্য সংগ্রাম করতেন তাহলে
হয়তো দেশের ক্ষুধার্ত জনগণ আজ
বাঁচার আশ্বাস পেতো। মিঃ হেলালী
ড্রাইভ আসনে বসে ভাবছিলাম
আপনার মহৎ মনের কথা। কারণ
এই ক'দিনেই আমি আপনাকে
চিনে নিয়েছি। আপনার মহান
চরিত্রকে আমি অভিনন্দন জানাই।

—দস্যু বনহুর।

চিঠিখানা একবার নয় দু'তিন বার পড়লেন। অন্য সময় হলে চিৎকার করে ডাকতেন, দারওয়ান, পুলিশ—পুলিশ, গ্রেপ্তার করো, গ্রেপ্তার করো কিংবা তিনি নিজেই রিভলভার নিয়ে ছুটতেন কিন্তু এ মুহূর্তে তার পা দু'খানা যেন কিসের সঙ্গে আটকে গেছে মনে হলো। দস্যু বনহুর স্বয়ং তাকে এই মুহূর্তে ড্রাইভ করে তার বাংলোয় পেঁওছে দিলো। এটা শুধু বিস্কর নয় অত্যাধিক আশ্চর্য ব্যাপার। কারণ তাঁরা সমস্ত পুলিশ প্রধান আজ গভীর রাত পর্যন্ত দস্যু বনহুর গ্রেপ্তার সম্বন্ধেই আলোচনা চালিয়েছে। বাংলোয় ফিরে এসেও তিনি দস্যু বনহুরকে নিয়েই ভাবছিলেন কিন্তু সেই দুর্দ্ধর্ষ দস্যু নিজে তাকে ড্রাইভ করে নিয়ে এলো...চিঠিখানা আরও একবার পড়লেন মিঃ হেলালী তারপর ডাকলেন—বয়! বয়!

বয় ছুটে এলো যদিও তার দু'চোখে ঘুমের আমেজ এখনও লেগে রয়েছে। চিঠিখানা সাহেবের হাতে পৌঁছে দিয়ে সে হয়তো পুনরায় বিছানায় শরীর এলিয়ে দিয়েছিলো। মালিকের ডাকে শশব্যস্তে এসে দাঁড়ালো—স্যার।

মিঃ হেলালীর হাতে চিঠিখানা এখনও রয়েছে, তিনি বয়কে লক্ষ্য করে বললেন—ড্রাইভার চিঠি দিয়ে কোথায় গেলো বলতে পারিস?

হাঁ পারি স্যার।

কোথায় গেলো সে?

স্যার তার বাসায় সে চলে গেছে।

গাড়ি কোথায়?

গেরেজে।

সে চলে গেছে?

হাঁ স্যার একটু আগে বললাম সে চলে গেছে।

আচ্ছা তুই শুরি যা।

বয় চলে যায়।

মিঃ হেলালী জানেন বয় চিঠিখানা তার হাতে পৌঁছে দেবার অনেক পূর্বেই বিদায় নিয়ে চলে গেছে দস্যু বনহুর এখন শত চেষ্টা করলেও তাকে পাওয়া যাবে না। তা ছাড়া অযথা সোর হাঙ্গামা বাধিয়েই বা কি লাভ হবে।

মিঃ হেলালী শয্যা গ্রহণ করলেন, তিনি এই চিঠির ব্যাপার নিয়ে পুলিশ অফিসারদের কারো কাছে টেলিফোন করলেন না বা পুলিশ অফিসেও জানালেন না।

বিছানায় শুয়ে পড়লেও তার চোখে ঘুম আসছিলো না, বারবার চিঠির কথাগুলো তার মনে আলোড়ন জাগাচ্ছিলো। দস্যু বনহুর চিঠিতে যা লিখেছে মিথ্যা নয়। পুলিশ মহল আজ দেশের অনাচারী, অত্যাচারী, অসৎ ব্যবসায়ী, দুষ্কৃতিকারীদের যদি কঠিন হস্তে দমন করে চলতো, যদি তাদের নিয়ে ভীষণভাবে কড়াকড়ি ব্যবস্থা নিতো, তাহলে দেশের আজ এমন করুন অবস্থা হতোনা। সমস্তা দেশ ব্যাপি ক্ষুধার্তের দীর্ঘশ্বাস, তাদের করুন অবস্থা দেশের মেরুদন্ডকে দুর্বল করে দিচ্ছে। এ সবের মূলেই যে দেশের

চোরাচালানী অসৎ ব্যবসায়ী দুষ্কৃতিকারী তাতে কোন ভুল নাই। যদিও পুলিশ মহল এ সব কিছু জানেন, বোঝেন, কিন্তু তারা কঠিন হস্তে দমনে ব্যর্থতার পরিচয় সব সময় দিয়ে এসেছেন কেনো, তারা কি পারেন না এ সব চোরা কারবারীকে খুজে বের করতে? নিশ্চয়ই পারেন কিন্তু কোথায় এবং কেনো তাদের এ দুর্বলতা......মি হেলালী শয্যা ত্যাগ করে উঠে মেঝেতে নেমে দাড়ান, পায়চারী করে চলেন তিনি আর ভাবেন এর কি কোন বিহিত ব্যবস্থা নাই। পুলিশ মহলের কাজ হলো দেশের অন্যায়কে দূরীভূত করা। দেশের কলুষতাকে মুছে ফেলা অথচ আজ পুলিশ মহল এসব ব্যাপারে নীরব...মিঃ হেলালী সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করেন। সিগারেট পান করতে করতে পায়চারী করে চলেন। আজ দেশময় হাহাকার, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিই এই অশান্তির কারণ। শুধু শহরাঞ্চলেই নয়, গ্রাম হতে গ্রামান্তরে এই অশান্তির আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। কালো বাজার, মুনাফাকারীরা দিন দিন প্রবল আকারে ফেঁপে উঠছে, আর দেশের নিরীহ জনগণ ক্রমান্বয়ে মৃত্যু মুখে এগিয়ে যাচ্ছে। এর কি কোন বিহিত ব্যবস্থা নাই? মিঃ হেলালী নিজের মনকে প্রশ্ন করেন।

মিঃ হেলালী শেষের কথাগুলো স্পষ্টভাবেই বলেছিলেন হঠাৎ তার পিছনে গম্ভীর শান্ত কণ্ঠস্বর ভেসে উঠে—হাঁ আছে।

চমকে ফিরে তাকায় মিঃ হেলালী, সঙ্গে সঙ্গে দুচোখে ফুটে উঠে বিস্ময়—কে? কে আপনি?

আপনি নয় বলুন কে তুমি?

মিঃ হেলালীর দুচোখে বিস্ময়—আপনি কি দস্যু বনহুর?

হাঁ আপনি ঠিকই ধরেছেন মিঃ হেলালী।

মিঃ হেলালী হাত বাড়ায় বনহুরের দিকে।

বনহুরও অবাক হয়ে হাত বাড়ায়।

মিঃ হেলালী করমর্দন করেন দস্যু বনহুরের সঙ্গে।

বনহুর এবং মিঃ হেলালী উভয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে উভয়ের মুখের দিকে। উভয়ে উভয়কে দেখছিলো গভীর মনোযোগের সঙ্গে।

মিঃ হেলালীই কথা বলেন প্রথম—ভেবেছিলাম আপনি চলে গেছেন।

জানতাম চিঠির কথাগুলো আপনার মনে প্রতিক্রিয়া জাগাবে তাই যেতে পারিনি। মিঃ হেলালী আপনার মহৎ মনের পরিচয় আমাকে মুগ্ধ করেছে, তাই নিভৃতে এলাম দেখা করতে। জানি আপনি আমাকে গ্রেপ্তার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন তবু আমার বিশ্বাস আছে আপনি আমাকে নাগালের মধ্যে পেয়েও গ্রেপ্তার করবেন না।

মিঃ হেলালী এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন বনহুরের মুখে ওর কণ্ঠস্বর যেন তার কানে অদ্ভুত এক মোহ সৃষ্টি করে চলেছে। যে দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার নিয়ে পুলিশ মহলে এতো তোড় জোর আর সেই দস্যু বনহুর তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে নির্ভীকভাবে দীপ্ত কণ্ঠে কথা বলছে।

বনহুর বলে চলেছে—ভাবছেন আমার দুঃসাহস কম নয়। আপনি জানেন আমি যা করেছি বা করছি তা মোটেই অন্যায় নয়। আমি শুধু অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চলেছি। আইনের চোখে হয়তো অপরাধ হতে পারে কিন্তু এ ছাড়া দুষ্কৃতিকারীগণকে শায়েস্তা করার ঔষধ আমার কাছে আর নেই, তাই আমি হয়তো অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ কাজ করে থাকি। মিঃ হেলালী দেশের অন্যায় অনাচার দূর করতে হলে দেশের প্রতিটি মানুষকে হতে হবে অন্যায় বিরোধী। বিশেষ করে পুলিশ মহলকে এ ব্যাপারে অত্যন্ত সজাগ হতে হবে, যেন দুষ্কৃতিকারীগণ তাদের কাছে কোন রকম সহায়তা না পায়। একটু থেমে বলে বনহুর—সহায়তা মানে দুস্কৃতিকারীগণকে সাহায্য করা নয়। যেমন ধরুন মিঃ ফিরোজ রিজভী কান্দাই শহরের সবচেয়ে অসৎ ব্যবসায়ী ছিলেন অথচ তিনি পুলিশ মহলের কাছে সব চেয়ে মহৎ ব্যক্তি ছিলেন। শুধু পুলিশ মহলই নয়, দেশের গন্যমান্য স্বনামধন্য ব্যক্তি প্রত্যেকেই তাকে সমীহ করতো শ্রদ্ধাও করতো কারণ তিনি জানতেন এই সব মানুষকে কেমন করে হাতের মুঠায় রাখতে হয়। মিঃ হেলালী, পুলিশ মহলের কর্তব্য দেশের স্বনামধন্য ব্যক্তিদের মহৎ ব্যবহারে বা তাদের প্রতাপে বিন্দু বিসর্গ বিচলিত না হয়ে ন্যায়তভাবে কাজ করে যাওয়া।

মিঃ হেলালী অস্ফুট কণ্ঠে বললেন—আপনি যে কথাগুলো বললেন প্রতিটি শব্দ মূল্যবান স্বীকার করি কিন্তু দোষীকে হত্যা করা আইনত অপরাধ।

এ কথা আমি পূর্বেই স্বীকার করে নিয়েছি মিঃ হেলালী। কিন্তু এ পথ ছাড়া আমার তো কোন পথ নেই কারণ আপনি এটাও জানেন দুস্কৃতিকারী যদি অপরাধী হিসাবে ধরাও পড়ে তবু তাদের সাজা দেওয়া কোন দিনই সম্ভব হয়না কারণ দুস্কৃতিকারী হয়তো দেশের স্বনামধন্য কোন ব্যক্তি। পুলিশ মহল তাদের কাছে ঋণীও থাকে সর্বক্ষণ। কারণ আপনাকে বুঝিয়ে বলতে হবেনা। মিঃ হেলালী আপনি এই দুর্নীতি থেকে মুক্ত 'আমি জানি কাজেই আপনার উপর দেশবাসীর যথেষ্ট ভরসা আছে। আজ বেশিক্ষণ বিলম্ব করা সম্ভব হবে না। চলি এবার কেমন?

মিঃ হেলালী বললেন—চলুন আমি গেট অবধি আপনাকে পৌছে দিয়ে আসি।

বনহুর হেসে বললো—চলুন।

পাশাপাশি দু'জন বেরিয়ে এলো বাংলা থেকে। গেট অবধি এগিয়ে এসে উভয়ে বিদায় নিলো উভয়ের কাজে।

ফিরে এলেন মিঃ হেলালী নিজের শয়ন কক্ষে। অনাবিল এক আনন্দে ভরে উঠেছে তাঁর মন। বিছানায় দেহটা এলিয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করলেন তিনি। একটি সুন্দর বলিষ্ঠ মুখ ভেসে উঠলো চোখের সামনে। কানের কাছে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো সেই দ্বীপ্ত শান্ত কথাগুলো। যাকে গ্রেপ্তারের জন্য তিনি কয়েক মিনিট পূর্বেও মনে মনে কৌশল আটছিলেন আর এই মুহূর্তে সে তার কাছে একজন মহান পুরুষ হিসাবে গণিত হলো।

অনাবিল একটা শান্তি অনুভব করলে মিঃ হেলালী নিজে মনে। অল্পক্ষণেই তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

পরদিন পুনরায় দস্যু বনহুর গ্রেপ্তার নিয়ে কমিটির মিটিং বসলো। সেখানে দস্যু বনহুরকে নিয়ে নানা রকম আলাপ আলোচনা চললো। আলোচনা চললো বনহুরের হত্যা রহস্য নিয়ে।

মিঃ হেলালী আজও যোগ দিয়েছেন কিন্তু আজ তিনি ধীরস্থির গম্ভীর। গত রাতের ঘটনাগুলো তার মনকে এখনও অভিভূত করে রেখেছে। তিনি ভাবছেন গত রাতটা তাঁর জীবনে এক পরম রাত তাতে কোন সন্দেহ নাই।

❑

মিস হুসনা এই নিন আপনার আব্বার সরকারী পোশাক সেদিন যা আপনার বিনা অনুমতিতে নিয়ে গিয়েছিলাম।

বিস্ময় ভরা চোখ দু'টো তুলে ধরলো হুসনা, অস্ফুট কণ্ঠে বললো— মিঃ চৌধুরী আপনি।

হাঁ, মিঃ চৌধুরী নয় দস্যু বনহুর।

বসুন।

আপনি ভয় পাচ্ছেন না তো?

সত্যি, আপনি ভয়ের বস্তু বটে। মিঃ চৌধুরী, বলুন তো এই যে পরপর কান্দাই শহরে হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়ে চলেছে এ সব আপনার কাজ?

অবিশ্বাসের কিছু নেই মিস হুসনা।

সত্যি বলছেন?

আপনি জানেন মিথ্যা বলা আমার অভ্যাস নয়।

দু'চোখ কপালে তুলে ঢোক গিলে বলে হুসনা—লোকে যাই বলুক আমি বিশ্বাস করিনা এ কথা। আমি জানি আপনি খুন করতে পারেননা।

একটু হেসে বলে বনহুর—যারা আমাকে ভালবাসে তারা কেউ এ কথা বিশ্বাস করতে চায়না। আপনি তাদের একজন।

মিঃ চৌধুরী, আপনি নরহত্যা করতে পারেন?

কর্তব্যের খাতিরে অভ্যস্থ।

বুঝলাম যারা অন্যায় করে যারা দুর্নীতিবাজ তাদের আপনি শায়েস্তা করেন কিন্তু মিঃ ফিরোজ রিজভী এবং তাঁর সঙ্গীগণ কি অপরাধ করেছিলো আপনার কাছে?

অপরাধ! না শুধু আমার কাছে নয় সমস্ত কান্দাই বাসীর কাছে তাঁরা অপরাধী ছিলেন। বিনা অপরাধে দস্যু বনহুর কারো কেশাগ্র স্পর্শ করেনা মিস হুসনা। হাঁ, জেনে রাখুন অচিরেই মিঃ রিজভীর ২নং পার্টনার দুনিয়ার পাটগুটিয়ে নেবেন।

মিঃ রিজভীর ২ নং পার্টনার! কে, কে সে?

যাক্ ও সব নিয়ে আপনার মাথা ঘামানো কোন প্রয়োজন নাই। এবার শুনুন, কেনো আপনার আব্বার সরকারী ড্রেস আমি নিয়েছিলাম?

কেনো, কি দরকার ছিলো এগুলো আপনার?

দরকার আপনার আব্বার ছদ্মবেশে মিঃ রিজভী এবং তার দলকে ফলো করা। কাজ শেষ হয়েছে তাই এগুলো ফেরৎ দিলাম। মিস হুসনা এখন অচিরেই আপনার আব্বাকে আপনারা ফেরৎ পাবেন।

আব্বা! আমার আব্বা বেঁচে আছে মিঃ চৌধুরী?

হাঁ, বেঁচে আছেন এবং সুস্থ শরীরেই আছেন তিনি।

কোথায় আছেন বলুন মিঃ চৌধুরী? আমার আব্বা কোথায় আছেন।

যখন তিনি ফিরে আসবেন তখন তাকেই জিজ্ঞাসা করবেন। আচ্ছা আজ চলি মিস হুসনা।

মিঃ চৌধুরী আপনি কি আলেয়ার আলো? সত্যি সবাইকে আপনি শুধু বিমুগ্ধ করেন কিন্তু কাউকে ধরা দেননা।

যা বলবেন আমি তাই, আলেয়ার আলোই বলেন আর ধূমকেতুই বলেন বা কুহেলিকা-ই বলেন। মিস হুসনা, সত্যি সেই দিনগুলির কথা আজও মনে পড়ে, সেই কুন্দল দ্বীপে আমরা দু'জনা বেশ ছিলাম। ফিরে এসে আবার জড়িয়ে পড়েছি এক কঠিন সমস্যার সঙ্গে।

মিঃ চৌধুরী, আমিই কি ভুলতে পেরেছি সেদিনের কথাগুলো। ঐ দিনগুলোর স্মৃতি আমাকে আজও আনমনা করে ফেলে। সত্যি আপনি আর আমি কত সুখে ছিলাম...

ঠিক ঐ মুহূর্তে মায়ের কণ্ঠস্বর—হুসনা! হুসনা।

বনহুর ব্যস্ত কণ্ঠে বলে—চলি মিস হুসনা।

আবার আসবেন তো?

আসবো। বনহুর কথাটা বলে দ্রুত বেরিয়ে যায় যে পথে এসেছিলো সেই পথে।

হুসনা দরজা খুলে দেয়—মা তুমি ডাকছো?

হাঁ, হাঁরে হুসনা তোর ঘরে কেউ যেন কথা বলছিলো না?

কই না তো?

তবে যে হাল্‌লু বললে।

হাল্‌লু এ বাড়ির পুরোন চাকর। সে ঘরের বাহির বেরিয়ে ছিলো কলতলায় যাবার জন্য। হঠাৎ তার কানে ভেসে এসেছিলো হুসনা আপার ঘরে কোন পুরুষ মানুষের গলার আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে মাকে ডেকে এনেছিলো সে।

হুসনা ঢোক গিলে বললো—হয়তো স্বপ্নে আমিই কথা বলছিলাম। কি বলতে যে কি বলেছি ভেবে পাচ্ছি না। তুমি যাও আম্মা ঘুমাবে যাও।

কি স্বপ্ন দেখছিলি মা?

একটা শুভ স্বপ্ন আজ দেখেছি আম্মা, কাল সকালে তোমাকে বলবো।

হাঁ, রাতে স্বপ্নের কথা বলতে নাই কাল সকালে বলো। হুসনার আম্মা চলে যান।

হুসনা দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ে। প্রাণ ভরে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে হুসনা—সে এসেছিলো আবার আসবে বলে গেছে।

❑

পদশব্দে মুখ তুললেন মিঃ আহসান সাহেব। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চুল রুক্ষ—দৃষ্টি ঘোলাটে। চোখ তুলে তাকিয়েই বলে উঠেন —আর কতদিন আমাকে তুমি বন্দী করে রাখবে বনহুর?

হাস্যোজ্বল দীপ্ত কণ্ঠে বলে বনহুর—আর বেশি দিন নয়। আপনি অচিরেই আপনার স্ত্রী কন্যার সঙ্গে মিলিত হতে পারবেন।

সত্যি! সত্যি তুমি আমায় মুক্তি দেবে?

শুধু আপনার স্ত্রী কন্যার মুখের দিকে তাকিয়েই আমি আপনাকে মুক্তি দেবো মিঃ আহসান। কিন্তু মনে রাখবেন অন্যায়কে কোন মুহূর্তে প্রশ্রয় দেবেন না। সে যেই হোকনা কেন।

যা বলবে আমি তাই করবো বনহুর, আমি তাই করবো......

বেশ আপনি প্রস্তুত থাকবেন অচিরেই আপনাকে আমরা আপনার বাসায় পৌঁছে দেবো।

সত্যি তো?

কেনো বিশ্বাস করতে পারছেন না আমাকে?

বিশ্বাস করি এবং চিরদিন করবো। মিঃ আহসান গভীর আবেগে কথাগুলো বললেন।

বনহুরের শরীরে জমকালো ড্রেস।

অদ্ভুত লাগছে তাকে।

মিঃ আহসান অবাক চোখে তাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন। মিঃ আহসানের মনে পড়ে সেদিনের কথা তিনি কিছু সংখ্যক পুলিশ ফোর্স নিয়ে গিয়েছিলেন মিঃ ফিরোজ রিজভীর বাড়ির ওখানে দস্যু বনহুর গ্রেপ্তার উদ্দেশ্য নিয়ে। শুধু তিনিই নন আরও পুলিশ অফিসার গিয়েছিলেন সেদিন কিন্তু কারো ভাগ্যে এমন ঘটনা ঘটলো না, ঘটলো তারই ভাগ্যে। তিনি কোন কারণ বশতঃ পুলিশ বাহিনীদের ছেড়ে একটু দূরে সরে এসেছিলেন অমনি দু'জন লোক তাকে ধরে ফেলে এবং মুখে রুমাল চাপা দেয়, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন মিঃ আহসান। যখন জ্ঞান ফিরলো দেখলেন একটি অর্দ্ধ অন্ধকার কক্ষ মধ্যে শয্যায় শুয়ে আছেন। এখন তিনি কোথায়, কে বা কারা তাকে এখানে এনেছেন কিচ্ছু বুঝতে পারেন নি তখন। পারলেন অনেক পরে, একটা লোক খাবার দিয়ে গেলো। মিঃ আহসানের অত্যন্ত ক্ষুধা পেয়েছিলো তাই তিনি খাবার সম্মুখে পেয়ে চুপ থাকতে পারলেন না।

খেলেন পেট পুরে তারপর নির্জন কক্ষে একা একা। কখনও পায়চারী করতে লাগলেন কখনও শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলেন অনেক কথা। প্রথমেই বুঝতে পেরেছিলেন তিনি এখন বন্দী কিন্তু কে তাকে এ ভাবে বন্দী করে রাখলো কি উদ্দেশ্য তার? যে লোকটা খাবার দিয়ে গেলো সে পুনরায় যখন এলো তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন মিঃ আহসান, আমি এখন কোথায়? এবং কে আমাকে এখানে এনেছে? কি উদ্দেশ্যে আমাকে এখানে আটক করে রাখা হয়েছে? মিঃ আহসানের কথায় লোকটা একটি মাত্র জবাব দিয়েছিলো সেদিন, বিলম্ব করুন সব জানতে পারবেন। জেনেছিলেন দু'দিন পরে। মিঃ আহসান বসে বসে সিগারেট পান করছিলেন। এখানে তিনি সেবনের জন্য তার প্রিয় সিগারেট থেকে বঞ্চিত হন নি। শুধু সিগারেটই নয়, সব কিছুই তিনি পেয়েছেন যা তার নিত্য প্রয়োজনীয়। এমনকি সংবাদপত্রও তাঁকে পড়তে দেওয়া হয়েছে রীতিমত। মিঃ আহসান সংবাদপত্রে তাঁর নিখোঁজ নিয়ে পুলিশ মহলের উদ্বিগ্নতা জানতে পেরেছেন। পুলিশ মহল জানেনা তিনি কোথায় আছেন। তিনি স্বইচ্ছায় আত্মগোপন করেছেন না কেউ তাকে বন্দী করেছেন কিংবা তিনি নিহত হয়েছেন এ সব নিয়ে সংবাদপত্রে নানা রকম সংবাদ তিনি পড়েছেন। এমনকি তাকে দাড়ি কামানোর জন্য সব সরঞ্জামও দেওয়া হয়েছে। মিঃ আহসান বসে বসে ভাবছিলেন ঠিক্ ঐ সময় কেউ যেন তাঁর কক্ষে প্রবেশ করলো। চোখ তুলে অবাক হলো, দেখলো তার কন্যার উদ্ধারকারী মিঃ চৌধুরী এগিয়ে আসছে তার দিকে।

মিঃ আহসান ভীত হলেন কারণ মিঃ চৌধুরীর আসল পরিচয় তার অজানা ছিলোনা। তিনি বুঝতে পারলেন তাকে দস্যু বনহুর বন্দী করেছে।

ততক্ষণে বনহুর এসে দাঁড়ালো মিঃ আহসানের পাশে, একটু হেসে বললো—গুড মর্নিং মিঃ আহসান।

মিঃ আহসান শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে ছিলেন কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপর বলেছিলেন—দস্যু তুমি আমাকে বন্দী করে এনেছো?

জবাব দিয়েছিলো বনহুর—হ্যাঁ।

কিন্তু কেনো? প্রশ্ন করছিলেন মিঃ আহসান।

বনহুর বলেছিলো সেদিন—আপনার সব প্রশ্নের জবাব আমি দেবনা মিঃ আহসান! মনে রাখবেন কোন মহৎ উদ্দেশ্যেই আমি আপনাকে আটক করে রেখেছি এবং যতদিন কাজ আমার সমাধা না হবে ততদিন আপনাকে আমি আটক রাখতেই বাধ্য হবো।

হেসে বললো বনহুর—এখানে আপনার কোন অসুবিধা হয়নি তো? ঠিক করে বলবেন মিঃ আহসান।

না, কোন অসুবিধা হয়নি আমার। সত্যি দস্যু হলেও তুমি মহৎ... বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে মিঃ আহসানের গলা।

বনহুর আর বিলম্ব না করে বেরিয়ে গেলো, কারো মুখে নিজের প্রশংসা শোনার মত সময় তার নেই।

❑

পুলিশ অফিসার মিঃ ইয়াসিন নিহত হবার পর থেকে শহরে ভীষণ এক চাঞ্চল্যতা পরিলক্ষিত হলো। এতো সাবধানতার মধ্যেও মিঃ ইয়াসিনকে দস্যু বনহুর হত্যা করলো কম কথা নয়।

কান্দাই জনগণের মনে দারুণ উৎকুণ্ঠা যদিও তারা জানে বিনা কারণে দস্যু বনহুর কাউকে হত্যা করেনা তবু মনে সবার আতঙ্ক না জানি কোথায় কে আবার প্রান হারাবে।

দিনের পর দিন এ আতঙ্ক বেড়েই চলেছে।

মিঃ ফিরোজ রিজভী ও তার সহকারীগণ নিহত হবার পর মিঃ গিয়াস উদ্দিন ভীষণভাবে ভীত আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন কারণ মিঃ ফিরোজ রিজভী নিজকে রক্ষা করার জন্যই কান্দাই ত্যাগ করে গিয়েছিলেন। তার সঙ্গে গিয়েছিলেন তার তিনজন বিশিষ্ট বন্ধু এবং সহকারী। পরে আর একজন সহকারী কেমন করে ফিরোজ রিজভীর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলো কান্দাই বাসী না জানলেও মিঃ গিয়াস উদ্দিন বুঝতে পেরেছিলেন দস্যু বনহুরের অসাধ্য

কিছু নেই। তাকেও যেন মিঃ রিজভীর সঙ্গে একত্রিত করে বাক্সে প্যাকেট করা হয় নাই তাই আশ্চর্য।

মিঃ গিয়াস উদ্দিনের সদা মৃত্যু ভয়, সে জানে এতো সাবধানতা এটা দস্যু বনহুরের কাছে কিছু নয়। সে যে কোন মুহূর্তে কখনও যমদূতের মত তার সম্মুখে হাজির হবে কে জানে।

মিঃ গিয়াস উদ্দিন ভাবছিলেন আর ক'দিন তার আয়ু আছে। এক মুহূর্তের জন্য তিনি বাইরে বের হননা। সদা সর্বদা প্রহরাবেষ্টিত হয়ে থাকেন। এমন কি রাতে যখন ঘুমান তখন তার বিছানার চার পাশে চারজন সশস্ত্র প্রহরী পাহারায় থাকে। বাড়ির বাহির তো দূরের কথা, ঘরের বাইরে মিঃ গিয়াস উদ্দিন বের হননা কোন সময়! নাওয়া-খাওয়া সব চলে তার শয়ন কক্ষে। বাইরের কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ করা বন্ধ করে দিয়েছেন তিনি। একমাত্র স্ত্রী এং চারজন বিশ্বস্ত প্রহরী ছাড়া নিজের ছোট ভাই এরও প্রবেশ নিষেধ রয়েছে মিঃ গিয়াসের কক্ষে।

মিঃ গিয়াস উদ্দিনের সাবধানতার কথা শহরের কারো অজানা ছিলোনা।

নানা জনে নানা রকম মতবাদ প্রকাশ করছে এ ব্যাপার নিয়ে। মিঃ গিয়াস উদ্দিনের এতো ভয়, সাবধানতা কেনো। তিনি যদি সৎ এবং মহৎ ব্যক্তিই হবেন তবে তিনি বাড়ির বাইরে আর বের হলনা কেনো? কেনোই বা এতো প্রহরীর ব্যবস্থা? অনেকেই বলছে ফিরোজ রিজভীর মৃত্যুই তার ভয়ের কারণ।

সমস্ত রাত ঘুম হতোনা গিয়াস উদ্দিন সাহেবের। শুধু মৃত্যু চিন্তাই নয় ব্যবসা সংক্রান্ত নানা রকম চিন্তা তার মাথার মধ্যে ঘুরপাক করতো। লোভি ব্যক্তিদের মৃত্যু ভয়ের চেয়েও অর্থ চিন্তা বেশি। মিঃ গিয়াস উদ্দিনের অবস্থা তাই হয়েছে। লাখ লাখ টাকার কারবার তার বন্ধ প্রায় কারণ তিনি আর এসব ঠিক মত দেখা শোনা করতে পারছেন না। প্রতিদিন হাজার হাজার টাকা যার আয় তিনি কি পারেন প্রাণের ভয়ে আত্মগোপন করে থাকতে। উসখুস করে তার মন, মাঝে মাঝে হিসাব নিকাশ দেখেন ঘরে বসেই।

সেদিন মিঃ গিয়াস উদ্দিনের ব্যবসা ব্যাপার নিয়ে বিদেশ থেকে এলেন তার এক পুরোন পার্টির লোক। কার্ড পাঠিয়ে জানালেন তিনি জব্রু থেকে এসেছেন।

কার্ড নিয়ে কে যাবেন মিঃ গিয়াস উদ্দিনের কাছে। শুধু তার স্ত্রী এবং চারজন প্রহরী ছাড়া কারো সাধ্য নেই তার কক্ষে প্রবেশ করে।

শেষ পর্যন্ত একজন প্রহরীই কার্ড নিয়ে এলো। মিঃ গিয়াস উদ্দিন কার্ড দেখে দীপ্ত হয়ে উঠলেন, তিনি তক্ষুণি তাকে ডেকে পাঠালেন কিন্তু পরক্ষণেই স্মরণ হলো এ কক্ষে কারো প্রবেশ নিষেধ আছে। তাই তিনি বাধ্য হয়ে চুপ রইলেন, পায়চারী করতে করতে ভাবতে লাগলেন কি করা যায়। পার্টির লোকের সঙ্গে দেখা না করলেও নয়। কারণ প্রায় তিন লক্ষ টাকা নিয়ে এসেছেন তিনি। মিঃ গিয়াস উদ্দিন যদি দেখা না করেন তবে ঐ টাকা নিয়ে ফিরে যাবেন তিনি। মিঃ গিয়াস উদ্দিন একেবারে অস্থির হয়ে উঠলেন—জান যায় যাক্ তবু টাকা তার চাই।

অনেক ভেবে চিন্তে পার্টির লোকের সঙ্গে দেখা করাই মনস্থির করে নিলেন মিঃ গিয়াস উদ্দিন সাহেব। কিন্তু কোথায় কি ভাবে তিনি দেখা করবেন। যদি দস্যু বনহুর জানতে পারে এ কথা। তিন লক্ষ টাকা আর গিয়াস উদ্দিন এর জীবন এ দুটোর জন্যই সে হামলা করে বসতে পারে।

গিয়াস উদ্দিন সাহেব ফোন করলেন পুলিশ প্রধান মিঃ জায়েদীর কাছে। পার্টির লোকের সঙ্গে দেখা না করলেই নয়। অথচ দস্যু বনহুরকেও ভয় আছে এমন অবস্থায় কি করবেন তিনি।

মিঃ জায়েদী জানালেন—ভয়ের কোন কারণ নেই। দস্যু বনহুর যাতে কিছু না করতে পারে এবং তিনিও যেন সুষ্ঠভাবে পার্টির লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ করতে পারেন তার সুব্যবস্থা করবেন।

মিঃ গিয়াস উদ্দিন ভরসা পেলেন, যা হোক একটা উপায় হবে।

ফোনে আরনও আলাপ হলো কখন কোথায় কি ভাবে পার্টির লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারবেন এটা। ব্যবস্থা অত্যন্ত গোপনীয় শুনে খুশি হলেন গিয়াস উদ্দিন সাহেব।

জব্রু থেকে পার্টির লোক এসেছেন তিনি গিয়াস কোম্পানীর হেড অফিসেই অপেক্ষা করছেন। তার সুবিধা অসুবিধার দিকে গিয়াস কোম্পানীর কর্মচারীবৃন্দ তীক্ষ্ণ নজর রেখেছেন যেন কোন ক্রুটি না হয়।

মিঃ জায়েদীকে ফোন করে ব্যাপারটা জানিয়ে মিঃ গিয়াস উদ্দিন কতকটা নিশ্চিন্ত হলেন। বেশি জানাজানি যাতে না হয় এ জন্য আর কাউকে জানালো না। এমন কি জাফরীকেও জানানো তেমন প্রয়োজন মনে করলেন না গিয়াস উদ্দিন সাহেব।

মিঃ গিয়াস উদ্দিন সন্ধ্যার পর তার শয়ন কক্ষে প্রহরী পরিবেষ্ঠিত অবস্থায় মিঃ জায়েদীর উপস্থিতিতে জব্রু থেকে আগত পার্টির সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন বলে মনোস্থির করে ফেললেন।

গোপনে সেই মত আয়োজন চললো।

সন্ধ্যার পর গিয়াস কোম্পানী থেকে একখানা গাঢ় লাল গাড়ি এসে দাঁড়ালো মিঃ গিয়াস উদ্দিনের বাস ভবনের সম্মুখে।

ইতিমধ্যে মিঃ জায়েদী এসে পৌঁছে গেছেন গিয়াস উদ্দিনের হল ঘরে।

কয়েকজন পুলিশ সশস্ত্রভাবে পাহারা দিচ্ছে।

লাল গাড়ি থেকে নামলেন জব্রু থেকে আগত অতিথি। মিঃ গিয়াস উদ্দিনের ছোট ভাই তাকে অভিনন্দন জানিয়ে হল ঘরে নিয়ে গেলেন।

মিঃ জায়েদীর সঙ্গে পরিচিত হলেন জব্রু থেকে আগত মিঃ জুইস্ হার্ড। সুন্দর সুদীর্ঘ সুপুরুষ মিঃ জুইস হার্ড এলেন, হাতে তার ব্রিফকেস্।

মিঃ জায়েদী তার সঙ্গে করমর্দন করলেন।

মিঃ গিয়াস উদ্দিনের ছোট ভাই পরিচয় করিয়ে দিলেন মিঃ জায়েদীর সঙ্গে মিঃ জুইস্ হার্ডের।

মিঃ জায়েদী নিজে মিঃ জুইসকে নিয়ে উঠে গেলেন উপরে মিঃ গিয়াস উদ্দিনের কক্ষে।

সিড়ির ধাপে ধাপে অস্ত্রধারী প্রহরী।

মিঃ জায়েদীর সঙ্গে সশস্ত্র পুলিশ ফোর্স।

সাধ্য কি দস্যু বনহুর প্রবেশ করে সেখানে।

কক্ষ মধ্যে মিঃ গিয়াস উদ্দিন মিঃ জুইস হার্ড এবং মিঃ জায়েদীকে অভিনন্দন জানালেন।

মিঃ গিয়াস উদ্দিন এবং মিঃ জুইস হার্ড কিছুক্ষণ তাদের ব্যবসা নিয়ে আলোচনা চললো। বেশিক্ষণ এ কক্ষে বিলম্ব করা ঠিক নয় বলে জানালেন মিঃ জায়েদী।

এবার টাকা গ্রহণের পালা।

মিঃ জায়েদী বললেন—মিঃ গিয়াস উদ্দিন আপনি আপনার পাশের গোপন কক্ষে গিয়ে টাকাটা গ্রহণ করুন কেনোনা এখানে আমরা ছাড়াও আরও চারজন প্রহরী আছে, কথাটা বাইরে ফাঁস হওয়া অসম্ভব কিছু না। কাজেই আপনি এ ব্যাপারে সতর্ক হন।

মিঃ জায়েদীর কথা অবহেলা করতে পারলেন না গিয়াস উদ্দিন। তিনি মিঃ জুইসকে সঙ্গে করে পাশের কামরায় গেলেন।

পাশের কামরার কোন দরজা জানালা ছিলোনা। সম্পূর্ণ কক্ষমিলে একটি দরজা, সে দরজাও মিঃ গিয়াস উদ্দিনের শয়ন কক্ষের মধ্য দিয়ে, কাজেই ভয়ের কোন কারণ ছিলো না।

মিঃ গিয়াস উদ্দিন এবং মিঃ জুইসহার্ড তাদের কাজ শেষ করছেন।

এ দিকে মিঃ জায়েদী একটি সংবাদ পত্র দেখছিলেন।

কাজ শেষ করে বেরিয়ে এলেন মিঃ জুইস হার্ড।

মিঃ জায়েদী বললেন—আপনাদের কাজ সমাধা হয়েছে?

হাঁ হয়েছে। কথাটা বলে আসন গ্রহণ করলেন জুইসহার্ড এবং সিগারেট কেস বের করে বাড়িয়ে ধরলেন—নিন আমরা ততক্ষণে ধুমপান করি আর মিঃ গিয়াস উদ্দিন টাকাগুলো হেফাযতে রেখে আসুন।

মিঃ জায়েদী মিঃ জুইস হার্ডের সিগারেট কেস থেকে সিগারেট তুলে নিয়ে তাতে অগ্নি সংযোগ করলেন।

ঠিক ঐ মুহূর্তে টেলিফোন বেজে উঠলো।

মিঃ জায়েদী রিসিভার তুলে নিয়ে বললেন—হ্যালো...পরক্ষণেই তিনি বললেন মিঃ জুইসহার্ড গিয়াস কোম্পানী থেকে আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছে, এক্ষুণি আপনাকে যেতে হবে বিশেষ কোন জরুরি কাজ আছে।

মিঃ জুইস এক মুখ হেসে বললেন—ধন্যবাদ, আমি এক্ষুণি যাচ্ছি মিঃ জায়েদী।

মিঃ জায়েদী বললেন—মিঃ গিয়াস উদ্দিন এখনও বেরিয়ে আসছেন না কেনো?

মিঃ জুইস হার্ড বললেন—হয়তো তাঁর কাজ শেষ হয়নি। আপনি বলবেন আমি চলে গেছি কারণ তার কাছে বিদায় নেওয়া আমার শেষ হয়েছে। ধন্যবাদ মিঃ জায়েদী...ব্রিফকেস হাতে উঠে দাঁড়ান এবং মিঃ জায়েদীর সঙ্গে করমর্দন করে বেরিয়ে যান তিনি।

মিঃ জায়েদী সিগারেট পান করতে করতে অপেক্ষা করতে থাকেন মিঃ গিয়াস উদ্দিনের এই বুঝি এলেন তিনি।

সিড়িতে জুইস হার্ড এর জুতোর শব্দ মিলিয়ে যায়।

মিঃ জায়েদী ক্রমান্বয়ে অস্থির হয়ে পড়েন এতোক্ষণও মিঃ গিয়াস উদ্দিনের কাজ সমাধা হলো না। ভাবলেন হয়তো বা টাকাগুলো পুনরায় গণনা করে দেখছেন। অনেক টাকা কাজেই দেরী একটু হবেই। মিঃ জায়েদী পুনরায় নিজের পকেট থেকে সিগারেট কেস বের করে একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করলেন তারপর আপন মনে সিগারেট থেকে ধূম্রত্যাগ করে চললেন।

কিন্তু এতোক্ষণও বেরিয়ে এলেন না মিঃ গিয়াস উদ্দিন আহম্মদ।

মিঃ জায়েদী হাত ঘড়ির দিকে তাকালেন সঙ্গে সঙ্গে বললেন—এতোক্ষণও মিঃ গিয়াস উদ্দিন তার টাকা গণনা শেষ করতে পারলেন না আশ্চর্য বটে। উঠে দাড়ালেন তিনি, তারপর পাহারাদার চারজনকে লক্ষ্য করে বললেন—তোমরা কেউ ভিতরে যাও গিয়ে দেখো মিঃ গিয়াস উদ্দিন কি করছেন? এতোক্ষণও তিনি বেরিয়ে আসছেন না কেনো?

পাহারারত চারজনের দু'জন ভিতরে চলে গেলো এবং পর মুহূর্তে চিৎকার করে বেরিয়ে এলো। মিঃ জায়েদী বিস্ময় ভরা কণ্ঠে বললেন—ব্যাপার কি?

পাহারাদার দু'জনের মুখ মন্ডল ফ্যাকাশে মরার মুখের মত রক্ত শূন্য। কোন কথা তারা বলতে পারছেনা।

মিঃ জায়েদী আর দু'জনকে আবার অন্য নির্দেশ দিলেন, কিন্তু ঠিক ঐ একই অবস্থা তারা কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এলো। তাদের চোখে মুখে ভয় বিহ্বল ভাব ফুটে উঠেছে, কেউ কোন কথা বলতে পারছে না।

একজন বললো—স্যার আপনি গিয়ে দেখুন।

মিঃ জায়েদী এবার বললেন—চলো আমি যাচ্ছি। মিঃ জায়েদী দরজা বিহীন কক্ষমধ্যে প্রবেশ করতেই তিনি দেখতে পেলেন মিঃ গিয়াস উদ্দিন সোফায় বসে আছেন তার বুকে সূতীক্ষ্ণ ধার ছোরা বিদ্ধ হয়ে আছে। চোখ দুটো উপরের দিকে উল্‌টে আছে। সে এক বীভৎস দৃশ্য। মুখের মধ্যে রুমাল গোঁজা, যেন কোন রকম শব্দ তার গলা দিয়ে বের না হয় একজন তার বুকে ছোরা বিদ্ধ করবার পূর্বে তার গলার মধ্যে রুমাল গুজে দেওয়া হয়েছে। গাল দু'টো বলের মত ফুলে আছে। ঠোঁট দু'টো ফাঁকা হয়ে আছে বিকৃত আকারে।

মিঃ জায়েদী দু'হাতে চোখ ঢাকলেন।

এমন সময় কেউ যেন মিঃ জায়েদীর কাঁধে হাত রাখলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ফিরে তাকাতেই অবাক হলেন, দেখলেন মিঃ হেলালী তার কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছেন।

মিঃ জায়েদী বললেন—আশ্চর্য মিঃ হেলালী—আশ্চর্য এ হত্যাকান্ড।

শুনেছি স্যার তাই গাড়ি নিয়ে ছুটে এলাম। বললেন মিঃ হেলালী।

মিঃ জায়েদীর দু-চোখে বিস্ময় ফুটে উঠে—এই মাত্র হত্যাকান্ড সংঘটিত হলো অথচ আপনি শুনেছেন?

হাঁ, কারণ, যে মিঃ গিয়াস উদ্দিনকে হত্যা করেছে সেই আমাকে টেলিফোনে জানিয়েছে এ হত্যাকান্ডের কথা।

আশ্চর্য।

আশ্চর্য কিছুই নয় স্যার মিঃ জুইস্ হার্ড ই স্বয়ং দস্যু বনহুর।

হতাশা ভরা কণ্ঠে বললেন মিঃ জায়েদী—এখন তাই দেখছি মিঃ হেলালী সেই ব্যক্তিই দস্যু বনহুর। একটু থেমে বললেন—আমাকেও হাবা বানিয়ে ছাড়লো সে।

এটা আপনার কোন দোষ নেই স্যার আপনার সাবধানতার কোন ত্রুটি হয়নি। যদিও সে আপনার সাবধানতার সুযোগই গ্রহণ করেছিলো সর্বত ভাবে।

মিঃ জায়েদীর মুখমন্ডল রাগে ক্ষোভে লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছে।

মিঃ হেলালী দেখলেন মিঃ গিয়াস উদ্দিনের বুকে ছোরা খানার পাশে একটি কার্ড লাগানো রয়েছে। কার্ডে কিছু লেখা আছে বলে মনে হলো। মিঃ হেলালী কার্ড খানা খুলে নিলেন নিহত গিয়াসের বুক থেকে। পড়লেন তিনি—

২নং জল্লাদ—
তার মহৎ আচরণ এবং মহৎ
ব্যবসার জন্য তাঁকে পুরস্কার
দিলাম।

—দস্যু বনহুর

মিঃ জায়েদী বললেন—ফিরোজ রিজভী ও তার সহকারীদের বুকেও এই চিহ্ন ছিলো।

হাঁ স্যার, কারণ মিঃ গিয়াস উদ্দিন ও মিঃ ফিরোজ রিজভীর সহকারী ছিলো এবং তিনি যে ২নং তাতে কোন ভুল নাই।

মিঃ জায়েদী তাকিয়ে আছেন নিহত মিঃ গিয়াস উদ্দিনের মুখের দিকে। একটু পূর্বে যে ব্যক্তি বাঁচার জন্য এতো সাবধানতা অবলম্বন করলেন আর কিনা এই বীভৎস পরিণতি।

ছোরাখানার বাট বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিলো ফোটা ফোটা।

মিঃ জায়েদী বললেন—কি অমানুষিক হত্যা। জানিনা কবে এ হত্যালীলা শেষ হবে।

মিঃ হেলালী বললেন—এ অমানুষিক হত্যা লীলার জন্য দায়ী আমরাই স্যার। কারণ দেশময় আজ নানা অনাচার অবিচার দুর্নীতি চোরা কারবার দেশ আচ্ছন্ন করে ফেলেছে অথচ আমরা পুলিশ মহল এর কোন রকম বিহিত ব্যবস্থা করতে পারছিনা। দেশের জনগণ আজ মরিয়া হয়ে উঠেছে। পেটে অন্ন নাই, পরনে বস্ত্র নাই, প্রতিটি জিনিসের মূল্য শুধু পঞ্চম গুণ নয় দশম গুণ বেড়েছে। এক টাকার জিনিস আজ দশ টাকা। স্যার বলুন এমন

অবস্থায় দেশের ক'জন মানুষ বেঁচে থাকতে পারে। দেশের এক শ্রেণীর মানুষ আজ অনাচার আর দুর্নীতি করে তারা ধরাকে সরা জ্ঞান করে। এক টাকার জিনিস তারা দশ টাকায় কেনো বিশ টাকায় কিনতেও পিছপা হয় না। আজ অথচ আজ দেশের যারা মেরুদন্ড সেই অসহায় মানুষের কি নিদারুণ অবস্থা। থামলেন মিঃ হেলালী তারপর বললেন—পুলিশ মহল যখন দুর্নীতি অনাচার অবিচার দমনে সক্ষম হচ্ছেন না তখন কেউ না কেউ দেশ ও দশের মর্মান্তিক অবস্থা লক্ষ্য করে কঠিন কঠোর হস্তে এই হত্যা লীলায় মেতে উঠেছে...

মিঃ জাফরী বললেন—একটু পূর্বে বললেন যে এই হত্যালীলা সংঘটিত করেছে সে নিজে, আপনাকে টেলিফোনে জানিয়েছে এ হত্যালীলার কথা?

হাঁ, এবং সে স্বয়ং দস্যু বনহুর।

কোথা থেকে ফোন করেছিলো বলতে পারেন?

যদি সে কথা বলতে পারতাম তাহলে এখানে না এসে গুটি কয়েক পুলিশ সহ সেখানেই ছুটে যেতাম। স্যার এবার লাশ পরীক্ষার জন্য মিঃ গিয়াস উদ্দিনের প্রাইভেট ডাক্তারকে ফোন করা হোক। এখনও তো বাইরের কেউ জানে না বা জানতে পারেনি এ হত্যালীলার কথা।

মিঃ হেলালী এতোবড় একটা হত্যাকান্ড আমাদের উপস্থিতিতে সংঘটিত হয়ে গেলো অথচ আমরা হত্যাকারী দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হলাম না এটা কত বড় লজ্জার কথা।

স্যার, লজ্জার কোন কারণ নেই। সবাই জানে দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করা সহজ ব্যাপার নয়।

মিঃ হেলালী আপনি দস্যু বনহুর সম্বন্ধে দুর্বলতা প্রকাশ করছেন।

স্যার, না করেই বা উপায় কি আছে বলুন? একবার নয় দু'বার নয়, বার বার আমরা পুলিশ বাহিনী তার কাছে পরাজয় বরণ করছি। স্যার, দস্যু বনহুর গ্রেপ্তারের চেয়ে এখন আমাদের বেশি হুসিয়ার হতে হবে দেশের অন্যায় অনাচার দুর্নীতি দমন করা। দেশের এই বিষাক্ত জীবাণু দুস্কৃতিকারীদের খুঁজে বের করে তাদের শায়েস্তা করা—যারা দেশের এই মর্মান্তিক অবস্থা সৃষ্টি করে চলেছে।

সেদিন আর বেশি কথা হয় না, ততক্ষণে লোকজন জেনে নিয়েছে মিঃ গিয়াস উদ্দিন নিহত হয়েছেন, কাজেই ভীড় জমে যায় বাড়ির সম্মুখে।

❑

ডাক্তার আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ জানাবো ভেবে পাচ্ছি না। সত্যি আপনি মহান মহৎ....কথাগুলো বলে বনহুর ডাক্তারের কাছে বিদায় নিয়ে মায়ের ঘরে প্রবেশ করলো।

পদশব্দে মুখ তলে তাকালেন মরিয়ম বেগম সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট কণ্ঠে বললেন—ওরে তুই এসেছিস?

হাঁ মা, তোমাকে দেখতে এলাম। বনহুর এসে মায়ের কোলের কাছে নিচে বসে মায়ের কোলে মাথা রেখে বলে—মা, মাগো তুমি সেরে উঠেছো!

মরিয়ম বেগম পুত্রের মাথায় হাত বুলিয়ে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে— হাঁ বাবা, সেরে উঠেছি।

মা, ডাক্তারের মুখে আমি তোমার সব সংবাদ শুনতাম। কখন তুমি কেমন আছো সব তিনি আমাকে বলতেন।

ওরে তুই কেনো আসিস নাই বলতো?

মা তোমাকে নতুন করে কি বুঝিয়ে বলবো বলো? তুমি তো জানো ইচ্ছা থাকলেও উপায় ছিলো না কারণ সব সময় পুলিশ ফোর্স এ বাড়ির উপর কড়া নজর রেখেছে। তাছাড়া একদিন আমি এসেছিলাম তুমি সেদিন অজ্ঞান অবস্থায় ছিলে। সত্যি মা-গো—সেদিন তোমাকে এক নজর দেখে আমার মনে কি যে কষ্ট হয়েছিলো তা তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারবোনা।

ওরে আমি জানি, সব জানি, তবু মন মানে না। তোকে দেখবার জন্য প্রাণ আমার অস্থির হয়ে উঠে!

তাইতো আমি ছুটে আসি। দেখো মা, তুমি আমার জন্য আর ভাবতে পারবে না। আবার যদি তোমার অসুখ হয় তাহলে আমি আর আসবো না বলে দিচ্ছি।

আজ কেমন করে এলে বাপ?

মা, সে এক অদ্ভুত কান্ড। ডাক্তারের সহায়তায় তাঁরই কম্পাউন্ডারের বেশে এসেছি। সত্যি তিনি বড় মহৎ ব্যক্তি।

হাঁ বাবা, আমি যখন অসুস্থ তখন ডাক্তার সব সময় তোর সম্বন্ধে আমাকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিতেন। সত্যি তার কথাগুলো আমার হৃদয় স্পর্শ করতো।

সব শুনেছি মা, আমি ডাক্তারের মুখে সব শুনেছি। ডাক্তার আমাকে কথা দিয়েছিলেন তোমাকে তিনি আরোগ্য করে তুলবেন। তাঁর কথা সত্য হয়েছে তুমি আরোগ্য লাভ করেছো...

এমন সময় নূর প্রবেশ করে সেই কক্ষে, বলে উঠে—আব্বু তুমি কখন এলে? আম্মি আম্মি দেখবে এসো কে এসেছে......

বনহুর উঠে দাঁড়িয়ে নূরকে টেনে নেয় কাছে, বলে সে কেমন আছো আব্বা?

নূর হেসে বলে—বলবোনা তুমি বড্ড দুষ্টো হয়েছো কত দিন আসোনি।

রাগ করোনা আব্বা। আমি অনেক দূরে গিয়েছিলাম তাইতো আসতে পারিনি।

অনেক দূরে? সে কোন দেশ আব্বু বলোনা?

আচ্ছা তোমাকে বলবো সে এক নতুন দেশ।

চলো আগে আম্মির কাছে চলো। নূর পিতার হাত ধরে টেনে নিয়ে চলে।

মনিরা গোসল শেষ করে সবে মাত্র বাথরুম থেকে বেরিয়েছে। একরাশ কালো চুল ছড়িয়ে রয়েছে পিঠে।

নূর কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করে বলে উঠে—দেখো আম্মি কে এসেছে......

মনিরা চোখ তুলে তাকাতেই মুহূর্তে তার মুখ-মন্ডল গম্ভীর হয়ে পড়ে।

নূর হেসে বলে—আম্মি আব্বু এসেছে তুমি কথা বলছোনা কেন? জানো আম্মি আব্বু কেনো এতোদিন আসেনি? অনেক দূর দেশে গিয়েছিলো, অনেক অনেক দূর দেশ। আব্বু সেই দেশের গল্প বলে শোনাবে। তুমি শুনবেনা আম্মি?

না।

কেনো। কোনা শুনবেনা আম্মি?

পরে বলবো, তুমি এখন যাও তো বাবা।

নূর গম্ভীর মুখে বেরিয়ে যায়। কতদিন পর তার আব্বু এসেছে অথচ তার আম্মি তার সঙ্গে কথা বলছেনা এটা খুব খারাপ লাগে নূরের।

নূর বেরিয়ে যেতেই বনহুর এসে দাঁড়ালো মনিরার সম্মুখে, দু'হাতে টেনে নেয় কাছে ওকে নিবিড়ভাবে।

মনিরা বলে উঠে—না, আমাকে তুমি স্পর্শ করোনা। তুমি শুধু অমানুষ হওনি, তুমি নর পশু হয়েছো....

মনিরা যা খুশি তাই বলো। যত খুশি বলো।

ভেবেছিলাম এখন মানুষ হয়েছো কিন্তু ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ তুমি কি হয়ে গেছো? চারিদিকে শুধু খুন আর খুন। এতো রক্ত পিপাসা তোমার?

ধীরে ধীরে গম্ভীর কঠিন হয়ে উঠে বনহুরের মুখ মন্ডল, দাঁতে দাঁত পিষে বলে উঠে সে—রক্ত পিপাসা নয় মনিরা রক্তের নেশা। আমি রক্তের নেশায় উন্মাদ হয়ে উঠেছি। কিন্তু কাদের রক্ত জানো? যারা নিরীহ মানুষের রক্ত শুষে নেয় তাদের......

পরবর্তী বই

রক্তের নেশা